# বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-জুলাই। সাল-২০২৬

বাঙালির ইতিহাস বিস্মৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্র

## বাংলায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিপূজা সঙ্কল্প সোনার বাংলার

*তারকেশ্বরে ২০ জুন "পশ্চিমবঙ্গ দিবস" উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি,
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।*

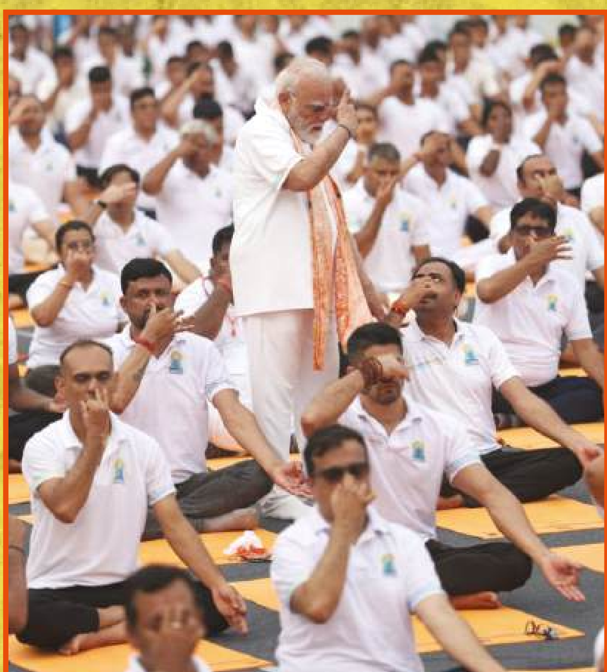

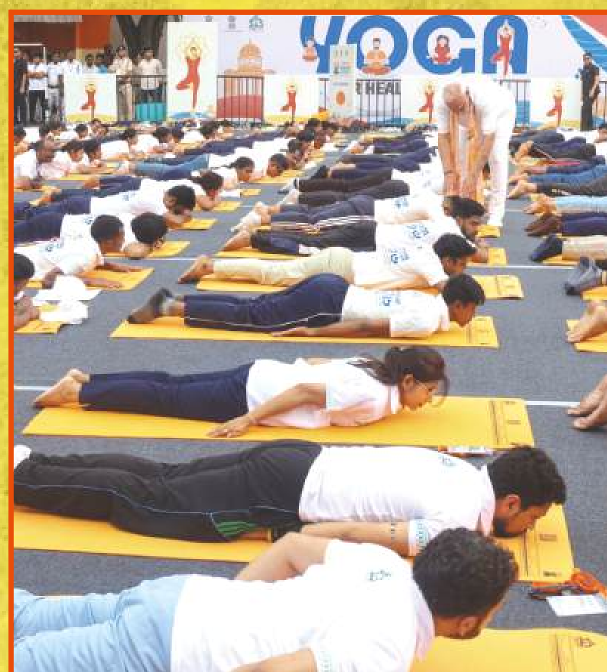


*কলকাতার রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মহাসমারোহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।*

*কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সুরাত ও আইএনএস নীলগিরির
কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।*

বঙ্গ
# কমলবার্তা
জুলাই সংখ্যা। ২০২৬

**স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ** ৪
*অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়*

**বদলের বাজেট, বিকাশের অঙ্গীকার** ৭
*অভিরূপ ঘোষ*

**অভিন্ন দেওয়ানি আইন**
**কেন এই আইন প্রণয়ন জরুরী** ১১
*বিনয়ভূষণ দাশ*

**বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার** ১৪
*জয়ন্ত গুহ*

**বারুদের নানুরে ব্যালটের মহাবিপ্লব**
**এক নতুন ভরসার সূর্যোদয়** ১৬
*খোকন দাস ও পল্লব মন্ডল*

**ছবিতে খবর** ১৮

**জরুরি অবস্থা ও ভারতীয় জনসংঘ**
**রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা থেকে জাতীয় বিকল্প শক্তি** ২৪
*দেবজিৎ দত্ত*

**বাঙালির ইতিহাস বিস্মৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্র** ২৮
*কৌশিক কর্মকার*

**অনন্য ব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (শেষ কিস্তি)** ৩২
*দিব্যেন্দু দালাল*

**সম্পাদক:** জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
**কার্যনির্বাহী সম্পাদক :** অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
**সহযোগী সম্পাদক :** জয়ন্ত গুহ
**সম্পাদকমন্ডলী:**
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, শুভজিৎ আওন, অনিকেত মহাপাত্র
**সার্কুলেশন:** সঞ্জয় শর্মা

## সম্পাদকীয়

অবশেষে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'মাস বাদে ৪ জুলাই শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে। অবশেষে।

দু'মাস সময় লেগে গেল তিনি যে 'প্রাক্তন' এটা অনুধাবন করতে? নাকি বাধ্য হলেন স্বীকার করতে যে তিনি 'প্রাক্তন'? নাকি এতটা সময় লাগলো ওনার বাইরের 'আমি'-র অহঙ্কারের কুয়াশা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে? অবশেষে।

অন্ধ স্নেহ আর অহংকারে শত পুত্র হারিয়েছিলেন গান্ধারী। মানব ধর্মের পথে ছিলনা বলেই কৌরব বংশের বিনাশ। গান্ধারী নিজে বারেবারে "যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ" বললেও তিনি জানতেনই না কখন তার স্নেহভাজনরা সরে গেছে ধর্মের পথ থেকে। যখন অনুধাবন করলেন তখন আর কিছুই করার নেই। অগত্যা বাণপ্রস্থ। অবশেষে।

সময় তিনি অনেক পেয়েছেন। কিন্তু চোখ বন্ধ রেখে কানে দেখলে কি করে বুঝবেন বাস্তব! সবার কি আর মহাভারতের সঞ্জয়ের মত সত্যনিষ্ঠ উপদেষ্টা মেলে? মেলেও বা যদি তাহলে সেই উপদেষ্টার আলাপনে আমরা কি কঠোর বাস্তব শুনতে পায়ই? নাকি তৃপ্তি দেয় অনগরল স্তাবকতা? স্তাবক পরিবৃত মোহজালে নিশ্চিত অভিষেক হয়। রাজাধিরাজ পদে ডালিমকুমারের। উদযাপনে কর্কশ ডিজে-র বাজনায় ঢেকে যেতে পারে অধর্মের উদ্বাহু নৃত্য। তবে কিছুই তো চাপা থাকেনা। বালি-পাথর-কয়লা-টাকা দিয়ে চাপা দেওয়া যায়না অধর্ম। বেরিয়ে আসে পচা দুর্গন্ধের মত। অবশেষে।

অবশেষে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দায়ে পড়ে? জানিনা তবে মনে পড়ে চাঁদ সওদাগরের মা মনসার পূজা। অবশেষে।

# স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ

অধ্যাপক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

**শ্যামাপ্রসাদ চারটি অগ্রগণ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি হল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটস্, সিন্দ্রি ফার্টিলাইজার এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ভারতবর্ষে প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা। এর আগে ইঞ্জিন এবং তার সব যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। পনের কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটি তৈরি হয় এবং ১৯৫০-এ কারখানা থেকে প্রথম ইঞ্জিন বেরোয়।**

দেশের স্বাধীনতা লাভের সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রধান বাঙ্গালী নেতা। জিন্নাহ-র গ্রাস থেকে বাংলার পশ্চিমের বেশ কিছু অংশ ছিনিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠন এবং সেসময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী জিন্নাহ-র সাধের কলকাতা-কে ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত রাখা তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ফলে হিন্দু মহাসভার নেতা হয়েও তৎকালীন কংগ্রেসি নেতারা শ্যামাপ্রসাদের নাম প্রথম মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত করেন। এই ব্যাপারে গান্ধীজীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবু শ্যামাপ্রসাদের মনে কিছু দ্বন্দ্ব ছিল মন্ত্রীসভায় যোগদান করা নিয়ে। কিন্তু সাভারকারও তাঁকে মন্ত্রীসভায় যোগদান করারই পরামর্শ দেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শিল্প ও সরবরাহ (Industry and Supply) তাঁকে দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁর পক্ষে অধিক উপযোগী হত শিক্ষাদপ্তর। কারণ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ নিজের জীবনের অধিকাংশ সময়েই শিক্ষার সেবায় কাটিয়েছেন। তিনি দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হলে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন এবং দেশের তরুণ সমাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিথ্যা ইতিহাস পড়তে বাধ্য হত না। কিন্তু বলরাজ মাধোক দুঃখ করে বলছেন মৌলানা আজাদ তাঁর ব্যক্তিগত এজেন্ডা রুপায়ণ করার জন্য এই দপ্তর নিজের হাতে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যাই হোক, তা সত্ত্বেও শিল্প দপ্তরের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তাঁকে প্রদান করা কংগ্রেসি নেতৃত্বের তাঁর প্রতি আস্থাই প্রমাণ করে। পূর্বে অখণ্ড বাংলার শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবেও প্রায় এক বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন- এটাই হয়ত তাঁকে শিল্পমন্ত্রক দেওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে। যাই হোক, এই দপ্তরে দায়িত্ব পাওয়ার ফলে ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তিস্থাপন ও ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পের বিকাশের রূপরেখা তৈরি করার সুযোগ পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। মাধোক বলেছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা ক্ষতি হল অর্থনীতি এবং শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে তা পূরণ হয়ে গেল।

১৯৪৮-এর ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার যে শিল্পনীতি প্রকাশ করে তাতে শিল্প সংক্রান্ত শ্যামাপ্রসাদের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। এই নীতির মূল কথা ছিল মিশ্র অর্থনীতি যেখানে সরকারের একটা

সর্বব্যাপী ভূমিকা থাকবে শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও উন্নতির জন্য। এতে বলা হল রাষ্ট্র বা সরকার প্রয়োজনে কোন শিল্প অধিগ্রহণ করতে পারবে বটে, কিন্তু বেসরকারী শিল্পদ্যোগেরও একটি বিশেষ জায়গা ও ভূমিকা থাকবে। শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে যাবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য সমস্ত শিল্পদ্যোগকেই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম শ্রেণীতে থাকবে সেই সব শিল্প যার পরিচালনা ও মালিকানা দুই'ই থাকবে সরকারের হাতে- এর মধ্যে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও রেল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরকারের একটি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা থাকবে, কিন্তু বেসরকারী শিল্পকে সরকারী শিল্পের পরিপূরক হতে হবে। এর মধ্যে থাকবে কয়লা, ইস্পাত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, জাহাজ নির্মাণ এবং খনিজ তেল। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে বাকি যাবতীয় শিল্প যা পুরোপুরি বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু সেখানেও সরকারের একটা নীতি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থাকবে। এই শ্রেণীতে থাকবে সার, সুতি ও পশম বস্ত্র, কাগজ ইত্যাদি শিল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ের কথাও এই নীতিতে বলা হয়েছিল।

এই নীতি অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদ চারটি অগ্রগণ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি হল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ( চিত্তরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গ) , হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফটস্ (ব্যাঙ্গালোর), সিন্দ্রি ফার্টিলাইজার (সিন্দ্রি, বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড) এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। কারখানাগুলি সম্পর্কে কিছু বলা যায় এখানে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ভারতবর্ষে প্রথম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা (তখন ইঞ্জিন মানে কয়লা বা বাষ্পের ইঞ্জিন)। এর আগে ইঞ্জিন এবং তার সব যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। পনের কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটি তৈরি হয় এবং ১৯৫০-এ কারখানা থেকে প্রথম ইঞ্জিন বেরোয়।

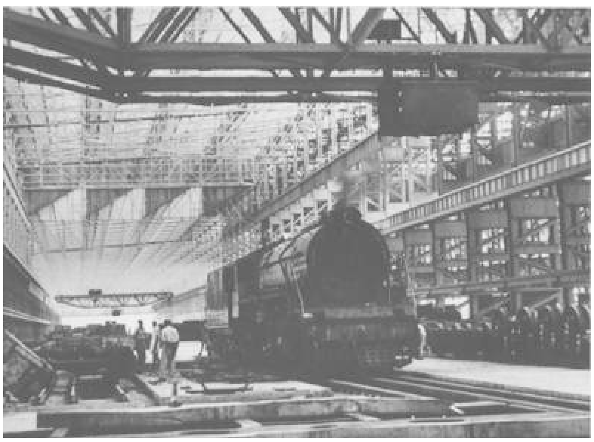

*স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশকে শিল্পক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তুলতে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উদ্যোগে ও প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস।*

তদানীন্তন বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের) ধানবাদের অদূরে একটি গ্রাম ছিল সিন্দ্রি। সারের সমস্যা মেটানোর জন্য এখানে একটি কারখানার পরিকল্পনা করা হয় যেখানে বছরে সাড়ে তিন লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরির পরিকল্পনা করা হয় এবং এর বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হবে তাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি সিমেন্ট কারখানারও পরিকল্পনা করা হয়, যা বছরে ১ লক্ষ টনের ওপর সিমেন্ট উৎপাদন করবে। এর জন্য একটি বিদ্যুৎ কারখানারও পরিকল্পনা করা হয় যা শুধু এই কারখানা দুটিকেই নয় গোটা বিহারকেই বিদ্যুৎ যোগাবে। এই কারখানার পরিকল্পনা শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বের একেবারে শুরুতে ১৯৪৭-এই করা হয়েছিল। এই সার কারখানা সরকারের প্রথম শিল্পোদ্যোগের একটি হওয়ার কারণে শ্যামাপ্রসাদকে নানারকম আমলাতান্ত্রিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দক্ষ হাতে শ্যামাপ্রসাদ সেসবের সমাধান করে কারখানার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

দামোদর নদের বন্যার কারণে তদানীন্তন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। ১৯৪৮-এ ঠিক করা হয় যে একটি কর্পোরেশন গঠিত হবে যার মালিকানা থাকবে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের হাতে। এর উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ জলপথ, বনসৃজন, ভূমিক্ষয় রোধ, জমির যথাযথ ব্যবহার, উৎখাত হওয়া মানুষের পুনর্বাসন, জনস্বাস্থ্য এবং সাধারণভাবে দামোদরের নদের উপত্যকার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। এই পরিকল্পনায় ছিল ৮টি জলাধারবিশিষ্ট বাঁধ (ড্যাম), কিন্তু শেষপর্যন্ত তৈরি হয় ৪ টি – দামোদরের উপনদীগুলির ওপর তিলাইয়া, মাইথন এবং কোনার এবং দামোদরের ওপর পাঞ্চেত। পুরো পরিকল্পনা শেষ হবার অনেক আগেই অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন।

ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে মহানদীর ওপর হীরাকুঁদ বাঁধ প্রকল্পও শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সেচের জল ছাড়াও পশ্চিম ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগায় এই প্রকল্প। শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বকালেই মধ্যপ্রদেশে একটি কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরির কল সরকারী মালিকানায় চালু হয় এবং কারখানার নামানুসারে জায়গাটির নাম হয় নেপানগর।

পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সহযোগিতা তাঁর মন জুড়ে ছিল, সেখানে মার্কসবাদী চিন্তার শ্রেণী-সংগ্রাম কখনো স্থান পায় নি। এই শ্রেণীসংগ্রাম করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে বামপন্থীরা প্রায় ৫৬,০০০ কলকারখানা বন্ধ করিয়েছে- যার ফল আজকের এই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি। শ্রমিক সম্প্রদায় যেমন তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতির আশ্বাস পেয়েছিল তেমনি শিল্প মালিকরাও জানতেন যে তিনি তাঁদের সমস্যা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করবেন। ১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরিজ অ্যাকটে বলা হয় কোন কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে তার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব কারখানার মালিককে নিতে হবে। এই আইন লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ কারখানায় শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার প্রায় দু'বছর পর একটি শ্রমিক-ম্যানেজমেন্ট বিরোধ বাঁধে। তখন শ্রমিকরা জানায় যে শ্যামাপ্রসাদ যদি এব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন তাহলে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন- তা

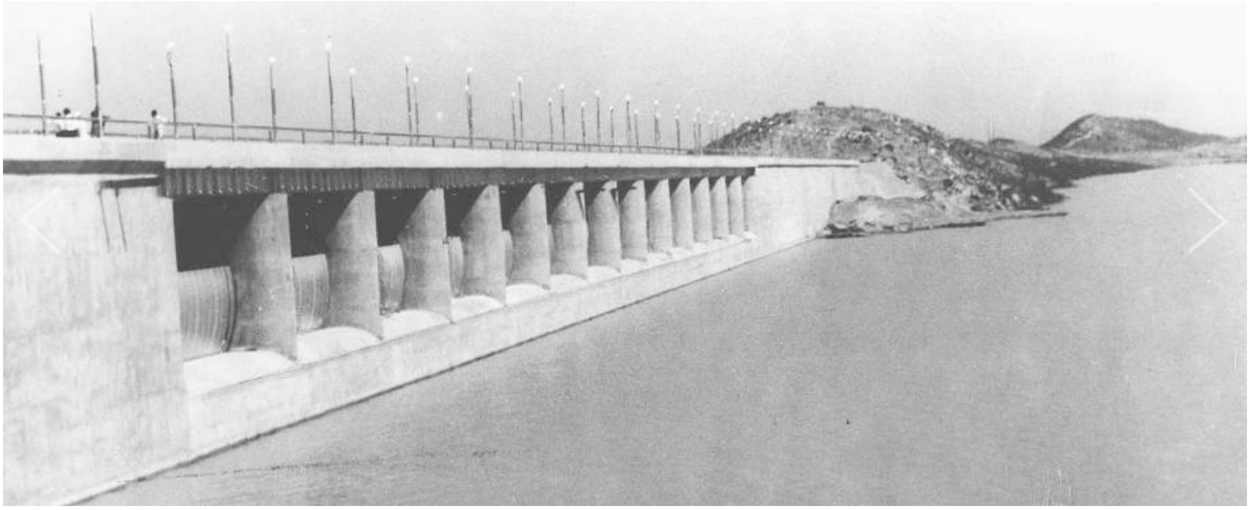

*১৯৪২ সালের ভয়াবহ বন্যার পর স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হিসেবে ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত হয়।*

শ্রমিকরা মেনে নেবে। এথেকেই শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রমিকদের আস্থার প্রমাণ মেলে।

দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ দেশলাই শিল্প, সূতি বস্ত্র শিল্প প্রভৃতির কিছু সমস্যারও সমাধান করেন। এক সুইডিশ শিল্পপতির শিল্পসংস্থা উইমকো-র দেশলাই কারখানা ছিল অমরনাথ, মাদ্রাজ, বেরিলি, কলকাতা ও ধুবড়িতে। বর্তমান তামিলনাড়ু-র শিবকাশী এলাকায় দেশলাইয়ের বেশ কিছু কুটির শিল্প ছিল। তারা অভিযোগ জানায় যে উইমকো-র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। এই সমস্যার নিরসনকল্পে শ্যামাপ্রসাদ প্রথমত হাতে তৈরি দেশলাইয়ের ওপর কর (এক্সাইজ ডিউটি) কমিয়ে দিলেন, প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরেট, গন্ধক এবং ফসফরাস আমদানির ব্যবস্থা করলেন এবং এই কুটির-শিল্পজাত দেশলাইয়ের দেশ জুড়ে সুবিধাজনক শুল্কে বিতরণের সুবিধা করে দিলেন। বেশি পরিমাণে কাঁচামাল কেনার জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এইসব কুটির শিল্প মাঝেমধ্যে পারিবারিক অশান্তির কারণে বন্ধ হয়ে যেত। শ্যামাপ্রসাদ তদানীন্তন মাদ্রাজ সরকারকে দিয়ে এদের সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে আনলেন এবং কাঁচামাল কেনা ও তৈরি জিনিস বিক্রির সুবিধাজনক শর্তে সরকারী ঋণেরও ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে এই শিল্পের ৯০% সমস্যা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন পশম, কলে তৈরি সূতি বস্ত্র ও তাঁত বস্ত্রের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ নজর দেন। হস্তচালিত তাঁতে বোনা পশমবস্ত্রের জন্য শ্যামাপ্রসাদ সমবায় গঠন করে একই ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করেন। সরকারের তরফ থেকে প্রচেষ্টা হল এদের প্রযুক্তি ও বাজারজাত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করানো। হস্তশিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় পশম প্রযুক্তি কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় বিপণি খোলা হল।

সূতি তাঁতশিল্পের অবস্থাও তখন একটু সংকটে ছিল। সে সময় এতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ কর্মরত ছিলেন। রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ তৈরির জন্য শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের কিছু নমুনা বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের বাণিজ্যিক আধিকারিকদের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে রাজী করালেন খাদি এবং হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের ব্যবহারের জন্য। রেলকে রাজী করালেন এর মাশুল কমাবার জন্য। উত্তরপ্রদেশের হরদুয়ারগঞ্জে একটি কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প শিক্ষালয়ও তৈরি করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা তাদের কাজে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন নকশা সৃষ্টি করতে পারেন।

মাত্র আড়াই বছরের মন্ত্রিত্বকালে শ্যামাপ্রসাদ কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হন। তথাগত রায় তাঁর 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮-এর ১লা ডিসেম্বর নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি গোপন চিঠিতে লিখলেন যে- সর্বত্র নাকি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে শ্যামাপ্রসাদ নিজের দপ্তরটিকে একটি ছোটখাট বাংলা বানিয়ে ফেলেছেন। আবার ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি আবার নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখে জানান যে শ্যামাপ্রসাদের দপ্তরে নাকি অতিরিক্ত বাঙ্গালী নিয়োগ হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এর মাত্র কিছুদিন আগেই ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালী হিন্দুদের কচুকাটা করা শুরু হয়েছে। নেহরু সেসব না ভেবে তখনও শ্যামাপ্রসাদের পিছনে লাগতে, তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে ব্যস্ত। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর হিন্দু নির্যাতনের কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে নেহরু বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষে আত্মঘাতী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ১৯৫০-এর ৮ই এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে (যা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে খ্যাত)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরু-র বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুর স্বার্থ রক্ষার্থে অনীহা বুঝে পদত্যাগ করেন। ফলে আরও অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির অনেক সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

# বদলের বাজেট, বিকাশের অঙ্গীকার

## পেশ হল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের রোডম্যাপ

অভিরূপ ঘোষ

**বাঙালি ভাষা এবং ঐতিহ্য রক্ষায় এর আগে পর্যন্ত সমস্ত বাজেট মিলিয়ে যা ঘোষণা হয়েছিল, বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট একাই সবকিছুকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষের হাতে যে রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উত্তরসূরীরাই ফিরিয়ে আনবে পশ্চিমবঙ্গের হারানো ঐতিহ্য এবং গৌরব।**

বাজেটের কয়েক দিন আগের কথা। অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্তকে ঘিরে ধরলেন সাংবাদিকরা। হাজারো প্রশ্নের সেদিন একটাই উত্তর দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী—তিনি ট্রেডমিলে হাঁটতে হাঁটতে বাজেট করেন না। দার্জিলিং থেকে দিঘা, সেদিন স্পষ্টতই বুঝে গিয়েছিল বহু বছর পর প্রকৃত অর্থেই একটা বাজেট আসতে চলেছে এ রাজ্যে। এমন একটা বাজেট, যা বহু বছরের হতাশা, ব্যর্থতা আর অন্ধকারময় অনিশ্চয়তার পর নতুন সূর্য হয়ে উঠবে। স্বাভাবিকভাবেই, সে বাজেটে পাহাড়চুম্বী প্রত্যাশা থাকবে, সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা থাকবে, অন্তহীন অভীপ্সা থাকবে। তবে এসবের উল্টোদিকে সব স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন এমন এক ব্যক্তি, যার চেয়ে যোগ্য অর্থমন্ত্রী হয়তো আমাদের রাজ্য আগে কখনও পায়নি।

২২শে জুন বাজেটের শুরুটাই ছিল ইঙ্গিতপূর্ণ। অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় গেলেন পাটের তৈরি একটা ফোল্ডারে বাজেট ভাষণ বন্দি করে। প্লাস্টিকের বদলে পাট কেন? তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন না। উত্তর বোঝা গেল কিছুদিন পর, যখন কাকিনাড়া জুট মিল-সহ অনেকগুলো পাটকল খুলে যেতে আরম্ভ করল পশ্চিমবঙ্গে।

প্রায় ৮,১৫,৮৯১ কোটি টাকার বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে দুপুর বারোটায় শুরু হল বাজেট পেশ। প্রথমেই প্রস্তাব এল ঋণের বোঝা কমানোর। তারপর একে একে এল সেই সব প্রস্তাব, যা খুশির বন্যায় ভরিয়ে দিল আসমুদ্রহিমাচল বাঙালিকে। শুরু করা যাক উত্তরবঙ্গ দিয়ে।

উত্তরবঙ্গের জন্য নতুন IIT এবং IIM তৈরি করতে চলেছে সরকার। তথ্য বলছে, গোটা দেশে একমাত্র উত্তরপ্রদেশে দুটি IIT

এবং মহারাষ্ট্রে দুটি IIM আছে। তবে কোনো একটি রাজ্যে একই সঙ্গে দুটি IIT আর দুটি IIM থাকার নিদর্শন নেই। পশ্চিমবঙ্গ হতে চলেছে দেশের সেই প্রথম রাজ্য, এবং এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের একটা বড় অংশীদার হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। সঙ্গে অবশ্যই থাকবে একটা নতুন AIIMS। আমাদের ভুলে চলবে না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছায় অনেক আগেই একটা AIIMS উত্তরবঙ্গে হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতা এবং জমি না দেওয়ার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। বিজেপি সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, নতুন IIT এবং IIM-এর সঙ্গে একটা AIIMS-ও পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। এই অঞ্চলের চিকিৎসার মান ও চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়াতে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সঙ্গে থাকছে ক্যান্সার হাসপাতাল এবং দার্জিলিংয়ের জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও ট্রমা সেন্টার। আশা করা হচ্ছে, আর কয়েক বছর পর উন্নততর চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গবাসীকে আর কলকাতায় ছুটতে হবে না। একই সঙ্গে মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এবং মালদার কালিয়াচকে নতুন মহিলা কলেজ স্থাপন করা হবে। বলে রাখা দরকার, এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৮টি মহিলা কলেজ আছে, যার মধ্যে মাত্র চারটি উত্তরবঙ্গে (প্রায় ২১টি শুধু কলকাতায়)। এই অসাম্য দূর করার চেষ্টা এবারের বাজেটে করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষ চা-শ্রমিক। বিগত বাম এবং তৃণমূল আমলে তাঁদের নিয়ে শুধু রাজনীতিই করা হয়েছে, উন্নয়ন একটুও হয়নি। ফলে চরম দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। সেই চা-শ্রমিকদের উন্নয়ন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় একদম প্রথম অংশে আছে, তা বাজেটে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটা বোর্ড, প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক উৎসাহ যোজনার পূর্ণ বাস্তবায়ন, এবং চা-শিল্পের পরিবেশ রক্ষার্থে পর্যটন ও বাণিজ্যিক অংশের পরিমাণ ৩০% থেকে কমিয়ে ১৫% করার প্রস্তাব যে পশ্চিমবঙ্গের গর্ব এই শিল্পকে আগামী দিনে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে, সেটা পরিষ্কার। এছাড়া শিলিগুড়িতে একটি চা-প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার গড়ে তুলতে ১০০ কোটি টাকার বিপুল বরাদ্দ করা হয়েছে এবারের বাজেটে। পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর নিয়ে গঠিত তরাই অঞ্চলের মশলা চাষিদের (আদা, হলুদ, গোলমরিচ, এলাচ) প্রসেসিং ও মার্কেটিংয়ের সুবিধার্থে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে একটি 'স্পাইস হাব' তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে, যা রূপায়ণের পর একটি নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে পাহাড়ে কিউই, অ্যাভোকাডো ও অর্কিড, এবং মালদার বিখ্যাত আম চাষের জন্যও।

উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষের রুটি-রুজি পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। পূর্বতন সরকারগুলোর আমলে পর্যটকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, তবে পরিকাঠামো বাড়েনি। পরিবহন, নিরাপত্তা বা অত্যাধুনিক পরিষেবা তো দূরের কথা, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জন্য পানীয় ও ব্যবহারযোগ্য জলের ব্যবস্থাটাও পূর্বতন সরকারগুলো করে উঠতে পারেনি। নতুন বিজেপি সরকার তার প্রথম বাজেটেই সেই মৌলিক চাহিদাসহ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ঝরনা যেহেতু এই অংশে জলের প্রধান উৎস, তাই প্রথমেই ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে পাহাড়ি ঝরনা পুনর্জীবিত করতে। বারাণসী-শিলিগুড়ি হাই-স্পিড ট্রেন, উত্তরবঙ্গে দুটি নতুন বিমানবন্দর এবং কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, পাহাড়ের জন্য দার্জিলিং হেরিটেজ ট্যুরিজম হাব আর তরাইয়ের জন্য ডুয়ার্স ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা নিশ্চিতভাবেই উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে এক অন্য উচ্চতায় তুলে দেবে।

আমরা দেখেছি, বিগত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের সেচব্যবস্থা এবং নদী-পরিকল্পনার কোনো রকম উন্নয়ন না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছিল, তেমনই অন্যদিকে প্রতি বছর বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছিল। এই দুই সমস্যা সমাধানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ৩.৪২ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচসুবিধা পৌঁছে দিতে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা করা হয়েছে। এর বাইরে মালদায় ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধস রোধেও আলাদা প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

মোদ্দা কথা হল, বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা আর প্রথম বাজেট উত্তরবঙ্গকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিল। একই কথা খাটে জঙ্গলমহল আর পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রেও। শুষ্ক জলবায়ুর কথা মাথায় রেখে দেশীয় প্রজাতির গবাদি পশুপালন, পশুখাদ্য চাষ এবং দুগ্ধশিল্পের কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরি করতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল বাজেটে। পশ্চিমাঞ্চলের ল্যাটেরাইট মাটির উপযোগী মুসাম্বি লেবু চাষ এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে দেওয়া হবে ৫০ কোটি টাকার বিপুল সহায়তা। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে সৌর বিকিরণ ক্ষমতা বেশি থাকায় কৃষকদের সৌরচালিত সেচপাম্পের জন্য কেন্দ্রীয় ভর্তুকির ওপর আরও অতিরিক্ত ১৫% রাজ্য ভর্তুকি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। এর জন্যও বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ঠিক হয়েছে, ভারত সরকারের 'পি এম আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের অধীনে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি শিল্প পার্ক এবং বীরভূমের সাঁইথিয়া শিল্প পার্কে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। যেহেতু পশ্চিমের জেলাগুলোতে পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ঠিক করা হয়েছে অযোধ্যা পাহাড়, মুরগুমা, খয়রাবেড়া, বরন্তী এবং গড়পঞ্চকোটকে যুক্ত

করে একটি ইন্টিগ্রেটেড ট্যুরিজম সার্কিট তৈরি করা হবে। ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহল চিড়িয়াখানায় ১৬০ একর জমির ওপর একটি নতুন 'টাইগার সাফারি' তৈরি করা হবে। উন্নত করা হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। পুরুলিয়ায় তৈরি করা হবে নতুন বিমানবন্দর। স্বাধীনতার পর থেকে পিছিয়ে রাখা পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর জন্য ঠিক করা হয়েছে, পুরুলিয়ায় একটি নতুন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হবে। ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং ঝাড়গ্রামে একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন অর্থমন্ত্রী।

আসা যাক সুন্দরবন প্রসঙ্গে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সংকটাপন্ন বাস্তুতন্ত্রে ঘেরা সুন্দরবনের চিরন্তন অস্তিত্ব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে এই বাজেটে তাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন জেলা হিসেবে গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মারণকামড় থেকে এই বদ্বীপকে রক্ষা করতে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে ৪,১০০ কোটি টাকার 'SHORE' প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধগুলিকে যেমন আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে স্থানীয় মানুষের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে, তেমনই সেন্ট্রাল স্পন্সরড স্কিমের অধীনে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৬০ কিলোমিটার বাঁধ প্রকৃতিনির্ভর আধুনিক প্রযুক্তিতে পুনর্নির্মাণ করা হবে। নদীভাঙন রোধ ও জলপ্রবাহের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহায়তায় ১,৩৫৩ কোটি টাকার 'Upper Delta Sundarban Project'-এর অধীনে মরা নদীখাত খনন ও সংস্কারের এক দূরদর্শী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের ৫৪টি জনবসতিপূর্ণ দ্বীপের জলপথকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুগম করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দে যেমন আধুনিক জেটি গড়ে তোলা হবে, তেমনই কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে সৌরচালিত নৌকার ব্যবহারকে দেওয়া হবে বিশেষ অগ্রাধিকার। সবুজ দেওয়াল আরও মজবুত করতে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শামিল করে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির পাশাপাশি পিপিপি মডেলে তৈরি হবে একটি সুসংহত 'ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান', যা নদী পর্যটন, বন্যপ্রাণী দর্শন, ভাসমান গ্ল্যাম্পিং এবং ই-ভেসেলের মেলবন্ধনে স্থানীয় কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সর্বোপরি, দুর্গম অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় সুচিকিৎসা পৌঁছে দিতে সুন্দরবনে একটি নতুন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল স্থাপনের পাশাপাশি মোটরবোট অ্যাম্বুল্যান্স এবং দ্বীপভিত্তিক প্রসূতি কেন্দ্র চালুর মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ এই বাজেটে স্থান পেয়েছে।

বহু বছর ধরে সরকারি শূন্যপদ ফেলে রেখে যেভাবে পূর্বতন সরকারগুলি যুবসমাজ ও কর্মপ্রার্থীদের বঞ্চিত করেছে, সেই অচলাবস্থা ভেঙে বর্তমান সরকার এক ধাক্কায় ১ লক্ষ নতুন শূন্যপদ পূরণের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর সিংহভাগ, অর্থাৎ ৫০,০০০ পদ, বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষক, অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য এবং ২০,০০০ পদ পুলিশ বিভাগের জন্য।

সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনার বঞ্চনা মোচন করে বর্তমানের ১৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতার ওপর অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ (DA) ঘোষণা করে মোট মহার্ঘ ভাতার হার ৩৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

শুধু স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই নন, সমাজের প্রান্তিক স্তরে দিনরাত পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের বঞ্চনার ক্ষতেও প্রলেপ দিয়েছে এই বাজেট। স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চুক্তিভিত্তিক কন্ডাক্টরদের মাসিক পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ১৬,০০০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, হোমগার্ড ও NVF কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক এক লাফে ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করার নজির তৈরি করেছে সরকার।

একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণের মূল স্তম্ভ আশা (ASHA) ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি, পিএম পোষণ (মিড-ডে মিল) প্রকল্পের রাঁধুনি ও সহায়িকাদের ১,০০০ টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধি, প্যারাটিচারদের ৫,০০০ টাকা মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি, SACT শিক্ষকদের ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীসেবীদের মাসিক ভাতা ২,০০০ টাকা বাড়িয়ে এই নতুন বিজেপি সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী আমলের চরম আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার দিন পেছনে ফেলে তারা প্রকৃত অর্থেই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে

*পর্যটনে জোয়ার আনতে বাজেটে বিশেষ নজর দার্জিলিং সহ গোটা উত্তরবঙ্গে।*

*বাজেটে সুন্দরবন নিয়ে বিশেষ নজর।*

সুশাসন ও নাগরিক কল্যাণের এক নতুন 'সেবা-শক্তি' জাগ্রত করতে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

তবে সব কিছুর উর্ধ্বে এই বাজেটের চমকপ্রদ দিক হল রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতির প্রস্তাব। শিল্পাঞ্চলের গণপরিবহণে গতি ও আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে দুর্গাপুর-আসানসোলের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রো সংযোগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সমীক্ষা শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্যে রেল ও সড়ক যাতায়াতকে সম্পূর্ণ বাধাহীন ও নিরাপদ করতে ৭০টি ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং চিহ্নিত করে সেখানে নতুন রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিপ্লব আনতে ডানকুনি-সুরাট ফ্রেট করিডর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডানকুনিকে একটি বিশ্বমানের লজিস্টিক হাবে উন্নীত করার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে।

কলকাতার যানজট লাঘব ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভের সঙ্গে ইএম বাইপাসের সংযোগ সুদৃঢ় করতে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ 'চিংড়িঘাটা-নিউটাউন এলিভেটেড করিডর' এবং শালিমার ও গার্ডেনরিচের মধ্যে একটি আধুনিক টার্মিনাল গড়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আকাশপথের প্রসারে কলকাতা বিমানবন্দরের ক্রমবর্ধমান ভিড় সামলাতে নদিয়ার কল্যাণীর কাছে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ একর জমিতে একটি নতুন 'গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর' স্থাপনের পাশাপাশি কৌশলগত পরিকাঠামোর সম্প্রসারণে কলাইকুণ্ডা এয়ার ফোর্স স্টেশনকে ৩৭ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জলপথ ও উপকূলীয় অর্থনীতির বিকাশে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে পিপিপি মডেলে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন, কুলপি-সহ অন্যান্য ছোট ছোট বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং মেরিটাইম বোর্ডকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগ ও দাবি পূরণ করে সাগরদ্বীপের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের পথ চিরস্থায়ীভাবে সুগম করতে মুড়িগঙ্গা সেতুর নকশা তৈরি ও জমি অধিগ্রহণের জন্য ১০০ কোটি টাকা এবং নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ার মধ্যে সব ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী একটি মেগা সেতু নির্মাণে আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঐতিহাসিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নদী ও সড়ক পরিকাঠামোর অভূতপূর্ব মেলবন্ধনে কালনা ও শান্তিপুরের মধ্যে ১,২০০ কোটি টাকার ভাগীরথী সেতু, ডানকুনি জংশন ও মগরার মধ্যে তিন লেনের বৈদ্যবাটি আরওবি এবং পাঁচটি ফ্লাইওভার-সহ ১,৮৫০ কোটি টাকার কৌশলগত রোড করিডর এবং বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর ৮০০ কোটি টাকার চার লেনের সেতু নির্মিত হবে আগামী দিনে।

আগামী দিনে রাজ্যের বিদ্যুতের বিপুল চাহিদা মেটাতে পিপিপি মডেলে সাঁওতালডিহিতে নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং বীরভূমের বক্রেশ্বরে আনুমানিক ২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মেগা সোলার প্রকল্পের ঘোষণা জ্বালানি ক্ষেত্রে এক নতুন সবুজ দিগন্ত খুলে দেবে।

বিরোধীদের একটা বড় অভিযোগ ছিল, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হবে। না, হিন্দি তো চাপানো হয়ইনি; উল্টে বাংলা ভাষার পাশাপাশি রাজ্যের বাকি ভাষাগুলিকেও তুলে আনার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবারের বাজেট থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের বাজেট-ইতিহাসে প্রথমবার রাজবংশী ভাষা, রাজবংশী একাডেমি এবং রাজবংশী লোকশিল্পীদের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বাজেটে সরাসরি ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে কুরমালি ভাষা, কুরমি একাডেমি ও কুরমি লোকশিল্পীদের উন্নয়নের জন্যও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতি রক্ষাতেও দেওয়া হচ্ছে ব্যাপক গুরুত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহ্য রক্ষার্থে ২৫ কোটি করে মোট ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, কালীঘাট, তারাপীঠ, ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, কিরীটেশ্বরী, কোন্নগর এবং বিভিন্ন শক্তিপীঠের মতো রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য 'হেরিটেজ কমিশন' তৈরির সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে। এছাড়া গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি জগদ্ধাত্রী পুজো, তারকেশ্বর মেলা, বারুণী মেলা, রাস মেলা এবং জল্পেশ মেলাকে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করা হবে বলে বাজেট ঘোষণায় জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত।

বাঙালির জন্য আনন্দের খবর, মায়াপুরকে কেন্দ্র করে তিন বছরে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'চৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা সার্কিট' গড়ে তোলা হবে খুব দ্রুত। এছাড়া দুর্গাপুজোর গ্লোবাল ব্র্যান্ডিংয়ের জন্যও বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাঙালির রক্ষাকর্তা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে হুগলির জিরাটে তাঁর পৈতৃক বাড়ি সংস্কার করা হবে এবং একটি ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি ও স্মারক পার্ক নির্মাণ করা হবে। তাঁর জন্মদিন, ৬ই জুলাই, রাজ্য সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়েছে।

বাঙালি ভাষা এবং ঐতিহ্য রক্ষায় এর আগে পর্যন্ত সমস্ত বাজেট মিলিয়ে যা ঘোষণা হয়েছিল, বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট একাই সবকিছুকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষের হাতে যে রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উত্তরসূরীরাই ফিরিয়ে আনবে পশ্চিমবঙ্গের হারানো ঐতিহ্য এবং গৌরব।

# অভিন্ন দেওয়ানি আইন

## কেন এই আইন প্রণয়ন জরুরী

বিনয়ভূষণ দাশ

**একটি সভ্য দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তো থাকবেই। থাকারই তো কথা! এটা তো ভারতবর্ষ। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান তো নয়। ভারতে ধর্মের শাসন নয় আইনের শাসন চলে। তাছাড়া বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। প্রতিশ্রুতি তো রাখতে হবে। এনিয়ে লুকোচুরির কোনও জায়গা নেই।**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানান তর্ক-বিতর্ক ও চাপানউতোর। বিশেষ করে আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কারবারিরা প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতায় যূথবদ্ধ সমালোচনায় সামিল হয়েছে। তাঁদের এই রাজনৈতিক আস্ফালন বিশেষ করে মুসলিম ভোটের দিকে তাকিয়ে। যেন ভারতে মুসলিম ভোটই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ; সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোট কোন ধর্তব্যের বিষয়ই নয় তাঁদের কাছে ।অথচ বাস্তব সত্য হল, হিন্দুদের ভোট না পেলে কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসতে পারবে না । কিন্তু তাঁদের কাছে দেশের ৮০ শতাংশের বেশী হিন্দু ভোট কোন মুল্যই রাখেনা। অথচ, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি দেশের সরকার হল, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য গঠিত একটি সরকার। “Government of the people, by the people, for the people”( Former American President Abraham Lincoln). অর্থাৎ, এ কথার অর্থ হল, একটি দেশের সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে, আর এইধরনের গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। ২০১৯ সালে একটি আবেদনে আহ্বান করা হয়, আমাদের দেশে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করার জন্য যাতে করে দেশে জাতীয় ঐক্য, এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে ন্যায়, সমতা ও মহিলাদের মর্যাদা রক্ষিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা আইন নিয়ে এত হইচই কেন ? এটা কি কোন দেশে নতুন হচ্ছে ? পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই কিন্তু এই আইন প্রচলিত আছে। আর যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে সেটাই কিন্তু স্বাভাবিক। তবুও এই হল্লাবুল্লা চলছে আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে একটু বেশী করে। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ড গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ এ সে রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এই আইনের

বিরোধিতায় কেউ সোচ্চার হয়েছে এমন শোনা যায়নি। এমনকি কথিত বিরোধী দলগুলিও যে খুব শোরগোল করেছে তাও নয়। গোয়া, গুজরাত এবং আসামেও এই আইন চালু হয়েছে।

তাই, প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চাই, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা আইন আসলে কি !

সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, " Uniform Civil Code for the Citizens---- The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." অর্থাৎ, রাষ্ট্র চেষ্টা করবে, দেশের সমস্ত নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইনি ব্যবস্থা দেবার জন্য আর তা প্রযোজ্য হবে সমস্ত ভারতব্যাপী। আর এই অভিন্ন দেওয়ানি আইন দেশের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে জাতীয় অভিন্ন আইন অনুযায়ী। এই আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই আইনের আওতায় থাকবে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, দত্তক গ্রহণ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমুহ।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিতর্ক কিন্তু আমাদের দেশে নতুন নয়, ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এই বিতর্ক চলছে।

১৮৪০ সালের 'লেক্স লকি রিপোর্টে ভারতীয় আইন প্রণয়নের সমতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এমনকি ভারতের সংবিধান মুসাবিদা (সংবিধানের খসড়া) করার সময়ে ডঃ বি আর আম্বেদকর এবং জওহরলাল নেহরুর মত নেতৃবৃন্দও একটি অখণ্ড অভিন্ন দেওয়ানি আইনের পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন। যাইহোক, তাঁরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিষয়টি সংবিধানের নির্দেশাত্মক রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (অনুচ্ছেদ- ৪৪)।

সেটা কেন বলা হয়েছিল তা ভারতীয় সংবিধান চালু হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই বোঝা গিয়েছিল।

**শাহ্‌বানো মামলা ( ১৯৮৫)**

শাহ্‌বানো নামে এক ৭৩ বছর বয়সের বৃদ্ধাকে তাঁর স্বামী 'তিন তালাক' দিয়েছিল। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে ভরণপোষণ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। তিনি আদালতে মামলা করেন। জেলা আদালত এবং রাজ্য উচ্চ আদালত উভয় আদালতই তাঁর পক্ষে রায় দান করে। এতে বাধ্য হয়ে তাঁর স্বামী সুপ্রিম কোর্টে এই বলে রায় পুনর্বিবেচনা করার আবেদন করেন যে পূর্বোক্ত রায় ইসলামী আইনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়; সুতরাং বৈধ নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও জেলা ও রাজ্য উচ্চ আদালতের রায় বহাল রেখে ১৯৮৫ এর ওই রায়ে জানায় যে, সর্বভারতীয় Criminal Code বা ফৌজদারি বিধির ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী " স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাবা- মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব" ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সঙ্গে সঙ্গে ওই রায়ে সকল নাগরিকের জন্য একটি 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' প্রণয়নেরও সুপারিশ করা হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ কেবলমাত্র 'ইদ্দত' অবধি, অর্থাৎ মোটামুটি ৯০ দিন অবধি দেওয়া হবে। আর ফৌজদারি আইনের ধারা ১২৫ অনুযায়ী স্ত্রীদের ভরণপোষণ সব ভারতীয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হল, একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তথাকথিত দাবীদার, কংগ্রেস নেতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একটি পশ্চাৎগামী আইন, The Muslim Women's (Right to protection on divorce ) Act (MWA) , 1986, পাশ করেন। এই আইনে বলা হয়, ফৌজদারি বিধির ১২৫ নং ধারাটি মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কংগ্রেস প্রবর্তিত এই আইনের ফলে মুসলিম মহিলাদের আবার মধ্যযুগে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়; বঞ্চিত করা হয় তাঁদের স্বাভাবিক ভরণপোষণের অধিকার থেকে।

**ড্যানিয়েল লতিফি মামলা**

মুসলিম মহিলা আইন, ১৯৮৬ কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করা হয় যে, এই আইনটি সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমানতার অধিকার এবং ২১ ধারা অনুযায়ী জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করে। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁদের রায়ে একটি মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করে বলে-'held that the amount received by a wife during iddat period should be large enough to maintain her during iddat as well as provide for her future. Thus under the law of the land, a divorced Muslim woman is entitled to the provision of maintenance for a lifetime or until she is remarried.' দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট মাঝামাঝি অবস্থান নিলেও কিন্তু কোন মুসলিম মহিলার সারাজীবন, অথবা তাঁর আবার বিবাহ অবধি সে ভরণপোষণের অধিকারী। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মুসলিম মহিলারা বঞ্চিতই থেকে যান, আইনটির বাস্তব প্রয়োগ হয় না। মৌলবাদী সমাজে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অবহেলিত থেকে যায়।

**এছাড়া সরলা মুদগল মামলা এবং জন ভাল্লামাত্তম মামলার কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।**

আমাদের দেশে গোয়া হল একমাত্র রাজ্য যেখানে আগে থেকেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত আছে। এই আইন গোয়াতে উনবিংশ শতাব্দীতে চালু করা হয় যা এখনও প্রচলিত আছে। এই আইন অনেক আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত। এই আইনে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বহুবিবাহ করতে পারে না এবং তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেনা। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ড রাজ্যেও চালু হয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। যাইহোক, আইনটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকছি। আমরা বরং সংক্ষেপে দেখে নিতে পারি প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলি।

* এই আইন বিভিন্ন ধর্ম, প্রথা, ঐতিহ্যের ভিন্নতাকে ভুলিয়ে সমগ্র ভারতকে একাত্ম করবে, সমগ্র ভারতবাসীকে একই আইনের

আওতায় নিয়ে আসবে৷ এইভাবে পারস্পরিক সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ ভুলিয়ে সামাজিক সংহতি, ধর্মীয় একতাবোধ জাগ্রত করতে ও দেশাত্মবোধ গঠনে সহায়ক হবে প্রস্তাবিত এই আইন৷

* বিভিন্ন নির্বাচনে যে ভোট ব্যাঙ্ক নীতি অনুসরণ করা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা সেটাও কমিয়ে দেবে৷

* বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইন থাকাতে যে পার্থক্য তৈরি হয়, সেটা এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দূর করতে সক্ষম হবে৷

* আমরা একটি আধুনিক রাষ্ট্র; এই রাষ্ট্রে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি করলেও আমাদের সামাজিক প্রগতি কিন্তু সেইভাবে হয়নি৷ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আমাদের সমাজকে এগিয়ে যেতে এবং একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠন করতে সহায়ক হবে৷

* এই আইন দেশের মহিলা জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত করবে এবং তাঁদের আরও অধিকার দেবে৷ এই আইন বিশেষভাবে দেশের মুসলমান মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত করবে এবং তাঁদের মধ্যযুগীয় অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে৷

* এই আইনে সমস্ত ভারতবাসী বিবাহ,বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, জমি-সম্পত্তি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান অধিকারের অংশীদার হবে৷

* এই আইন সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনে উৎসাহ দেবে৷ এতে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যাহত হবে না৷

* প্রকৃতির নিয়মই হল পরিবর্তনশীলতা; কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী কোন বিশেষ আইন মেনে চলবে, অন্য আইন মানবে না এমন হতে পারে না৷ গণতান্ত্রিক দেশে সবাইকে একই আইনের আওতায় থাকতে হবে৷ ফৌজদারি আইন মানলে ক্ষতি নেই, কিন্তু দেওয়ানি বিধি মানব না -- এই দ্বিচারিতা চলতে পারে না৷

* অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইন থাকায় যে জটিলতা তৈরি হয় তাও দূরীভূত হবে এবং এতে বিচারালয়গুলির কাজও জটিলতামুক্ত হবে৷ এক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের এবং রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

কিন্তু বিজেপি বিরোধী দলগুলির যূথবদ্ধ অপপ্রচারের ফলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এই আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে৷তাঁদের বোঝানো হচ্ছে, এই আইন তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে; তাঁদের ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে৷ বিরোধী দলগুলি রাজনৈতিক কারণে প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতা করছে৷ অথচ তাঁদের এই বিরোধিতার কারণ যে 'টার্গেট গ্রুপ' তাঁদের মহিলারাই এই আইন প্রণয়নে সবচেয়ে বেশী সুবিধা পাবেন, উপকৃত হবেন৷

এক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, কোন আইনই কখনও বিরোধিতা ছাড়া প্রণীত হয়নি৷ এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; রাজা রামমোহন রায়কেও সতীদাহ প্রথা রদের ক্ষেত্রেও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল৷ এমনকি তাঁকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু তাঁরা ভীত হয়ে থেমে যাননি, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন৷ ফলে কুখ্যাত ওই আইনগুলি রদ করা সম্ভব হয়েছে৷ আরও মনে রাখতে হবে, সবাইকে বুঝিয়ে, সবাইকে খুশী করে কোন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র৷ যারা প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তানে না গিয়ে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে থেকে যাওয়া পছন্দ করেছেন (opted), তাই গণতামত্রিক শাসন, গণতন্ত্রের আইন তাঁদের মানতে হবে৷ অপ্রয়োজনীয় উস্কানি দিয়ে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগিয়ে তোলা কোনমতেই কাম্য নয়৷ আইনটি প্রণীত হলে মূল সংবিধান প্রণেতাগণকে যথার্থ সম্মান জানানো হবে এবং ভারতকে একটি যথার্থ আধুনিক, উন্নত, গণতান্ত্রিক দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে৷ মনে রাখতে হবে, এক দেশে এক আইনই থাকবে৷ One Nation, One Law. বাংলার সুসন্তান, ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই কবেই চেয়েছিলেন, এক নিশান, এক প্রধান, এক বিধান৷ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত প্রথম বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করার কথা ঘোষণা করেছে৷ এছাড়া আরও জানানো হয়েছে, বিলটির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে৷ কমিটিকে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ বিলটি এই বৎসরের আগস্ট মাসে বিধানসভায় পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে৷ বিলটি পেশ হলে সেটি বিধানসভায় পাশ হয়ে যাবে আশা করা যায় কারণ বিধানসভায় রাজ্যের শাসক দল বিজেপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে৷ কিন্তু প্রস্তাবিত এই বিলকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলির যূথবদ্ধ অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে৷ তাঁরা বিলটিকে মুসলিম এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরোধী বলে অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে৷ অথচ, এই বিলের প্রস্তাবক দল বিজেপি স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাঁদের দল বিজেপি দীর্ঘদিন যাবত তাঁদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে৷ রাজ্যের মানুষ তাঁদের এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা প্রকাশ করে তাঁদের নির্বাচনে জয়ী করেছে৷ দল এও পরিষ্কার করে দিয়েছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৫ ) এবং ৩৪২ অনুযায়ী দেশের এবং রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই আইন প্রযোজ্য হবে না৷তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট , স্বকীয়তা, সংবিধান স্বীকৃত প্রথা, রীতি এবং বিশেষ অধিকার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের বিজেপি সরকারের একটি 'দায়' হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করা৷

প্রস্তাবিত এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইনে পরিণত হলে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ 'এক আইন, এক প্রধান , এক বিধানের' দিকে এই রাজ্য এবং দেশ এক কদম এগিয়ে যাবে৷

# বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার

## বিকাশের বিরোধিতায় মানুষবিচ্ছিন্ন বাম-তৃণমূল

জয়ন্ত গুহ

**কিসের আপত্তি? কেন আপত্তি বিরোধীদের? বাংলার বিকাশের সঙ্গে বাংলার প্রতিটি মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এগিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল সহযোগিতার। বাংলার স্বার্থে। বাংলার মানুষের স্বার্থে। বাংলার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে তোলার স্বার্থে। বাংলার তরুণ তরুণীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে।**

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার। মহাজাগতিক নিয়মে এই অঙ্ক কমে-বাড়ে। কিন্তু যদি বেহায়া প্রশ্ন আসে মনে, সিপিএম-তৃণমূলের দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ভাবনার দূরত্ব কতটা? মুশকিলে পড়তে হবে নিশ্চিত। 'সুরাবর্দি' পদবী, হ্যাঁ শুধুমাত্র ওই একটি পদবীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দু বাঙালির যে মহাজাগতিক দূরত্ব, শুধুমাত্র ওই একটি পদবীর সঙ্গে এ রাজ্যের প্রতিটি ভারতীয়ের যে অকল্পনীয় আতঙ্ক ও ঘৃণার যোগাযোগ তার পরিমাপ হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে কিন্তু সিপিএম ও তার 'ফিশ-ফ্রাই'তুতো ভাই তৃণমূলের -এর ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, 'বিকশিত-দেবতুল্য শোভনীয়-নির্মম' ব্রাহ্মণ সন্তানেরা যারা ওই 'সুরাবর্দি' পদবীকে সামনে রেখে অপমান করেছে এ রাজ্যের হিন্দু বাঙালি ভোটারদের, যারা গত ৫০ বছর ধরে 'সুরাবর্দি' পরিবারের না হয়েও বাংলায় শাসন চালিয়েছে হিন্দু বাঙালি ঘাতক 'সুরাবর্দি'-র কায়দায়- তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ঘৃণার পরিমাণ সম্ভবত ছাড়িয়ে গেছে সূর্য থেকে পৃথিবীর মহাজাগতিক দুরত্বকেও।

'সুরাবর্দি'র শাসন বা মুসলিম লিগের শাসন একই। সেই ধারা মেনেই বাংলায় একই শাসন চালিয়েছে বাম-তৃণমূল ৫০ বছর ধরে। মরিচঝাঁপি থেকে সন্দেশখালিতে অসহায় হিন্দু বাঙালির ওপর যে অত্যাচার চলেছে তা তো ভারতবিরোধী, হিন্দু বাঙালি বিরোধী 'সুরাবর্দি'র ভাবনারই পরিবর্তিত রূপ। কখনও সেই আতঙ্কের প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি। কখনও জোড়া ফুল। এখন এই ভাবনাকে ওরা

দর্শনের 'বিকাশ'ও বলতে পারে বা বাংলার বাঙালির প্রতি 'দর্শনীয় মমতা'ও বলতে পারে। সেটা একান্তই ওদের ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা বিপুল ভোটে বিজেপিকে এরাজ্যে ক্ষমতায় এনেছে তারা কি কখনো ভুলবে ১৯৪৬ সালে 'সুরাবর্দি' বাহিনীর অসহায় হিন্দু কোতল? মরিচঝাঁপি-সন্দেশখালিতে অসহায় হিন্দু বাঙালির ওপর নির্মম অত্যাচার? মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা? বিজন সেতুতে হিন্দু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা?

আসলে ওদের কাছে 'সুরাবর্দি' শুধু একটা রাস্তার নাম ছিলনা। 'সুরাবর্দি' না 'সুরাবর্দি'র পিতা না 'সুরাবর্দি'র প্রপিতামহ- এসব ছেলেভোলানো যুক্তি। ওদের কাছে ব্যক্তি নয়, গুরুত্বপূর্ন ছিল 'সুরাবর্দি' পদবী। সেকুলারিজমের নামে ওই পদবীই ছিল ওদের বাঙালি হিন্দুকে ভয় দেখানো দর্শনের ভিত্তি। রাস্তার নাম 'সুরাবর্দি' রাখা বা সেই রাস্তার নাম পরিবর্তনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতা কি আসলে হিন্দু হোমল্যান্ডে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধিতা করা? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানে চলে যাওয়া থেকে বাঁচানোর বিরোধিতা করা? কাদের বার্তা দিতে চাইছে ওরা? বাংলাদেশের হিন্দু বিরোধী 'সুরাবর্দি' বাহিনী জঙ্গি জামাতিদের? পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কাঠমোল্লাদের? নাকি পশ্চিমবঙ্গকে আশ্রয় করে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে সীমান্তে যে ভারতবিরোধী শক্তি অবৈধ অনুপ্রবেশের আন্তর্জাতিক অপারেশন চালায় তাদেরকে বার্তা দিতে চাইছে ওরা? যদি তাই হয় তবে সে গুড়ে বালি। বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে, শিল্প-শিল্পপতি-বানিজ্যকে পশ্চিমবঙ্গমুখী করতে রাজ্যে যে হুমকি-হামলা-ভয়মুক্ত পরিবেশ দরকার তা প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত রুপায়ন করতে সঙ্কল্পবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

*"টাটা ফিরবে, শিল্প ফিরবে, চাকরি ফিরবে — আর পশ্চিমবঙ্গও এগোবে,"- শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি।*

এ সরকার ভরসার সরকার। সবার সঙ্গে সবার বিকাশের সরকার। এ সরকার মানুষের সরকার। এ সরকার হিন্দু বাঙালির সরকার। এ সরকার ভারত বিরোধীতার সরকার নয়। এ সরকার প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক (ধর্ম বা মতামত যাই হোক) যারা দেশকে ভালবাসে তাদের সকলের সরকার। এ সরকারে ধর্মের শাসন চলেনা। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মত। এ সরকারে আইনের শাসন চলে। চলে বলেই তো দ্রুত লাগু হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। যা ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এ রাজ্যে বসবাসকারী প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জন্য কল্যাণময়। যে বিধি ভেঙ্গে দেবে ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি অমানবিক আইনী বৈষম্য। পাশাপাশি জনজাতি সমাজের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে তাঁদেরকে এই বিধির আওতার বাইরেই রাখা হয়েছে। তাতেও আপত্তি এ রাজ্যের বিরোধীদের। কিন্তু কেন? সকল নাগরিকের জন্য সমান নাগরিক আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে সংবিধানপ্রদত্ত তফসিলি জনজাতির বিশেষ রক্ষাকবচ—এই দুই বিষয়কেই একসঙ্গে প্রাধান্য দিয়ে কি অন্যায় করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি? পশ্চিমবঙ্গ সরকার? ভারত সরকার? যদিও এই বিধি কিন্তু সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে রাজ্যের অর্থনীতিকে বিকশিত হতে সাহায্য করবে। এই বিকাশের বিরোধিতাই কি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়-দের একমাত্র লক্ষ্য?

এ রাজ্যে অভিন্ন আইন থাকলে পর্যটকদের আইনি ভরসা বাড়বে। যা দার্জিলিং বা সুন্দরবনের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে আরও বেশি বিনিয়োগ টানতে সাহায্য করবে। বাইরের বিনিয়োগকারীদের এ রাজ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করবে এই বিধি। অভিন্ন বিধি থাকলে, সরল নিয়মকানুন থাকলে, আইন নিয়ে জটিলতা না থাকলে বিনিয়োগকারীরা ভরসা পাবে এ রাজ্যে নতুন কারখানা বা শিল্প স্থাপনে। রাজ্যের সামগ্রিক 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস' মানে সম্পত্তি কেনা, হস্তান্তর বা ব্যবসা পরিচালনার চুক্তিগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থাকলে যা এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন ঋণের ভারে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে মমতাপন্থী তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামেদের আপত্তিটা কোথায়? কেন? বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা নাকি বিরোধিতায় জোরালো যুক্তি আছে? মমতাপন্থী তৃণমূলের আপত্তি কেন? খেলা-মেলা দেদার ভাতার আড়ালে চুরি বন্ধ হয়ে গেছে? বালি-পাথর-মদের টাকা ভূতের পকেটে ঢুকছে না? তোলাবাজি অর্থনীতি বন্ধ হয়ে গেছে? কিসের আপত্তি? কেন আপত্তি? সোজা কথা, বাংলার বিকাশে বাংলার প্রতিটি মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এগিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা সহযোগিতার। বাংলার স্বার্থে। বাংলার মানুষের স্বার্থে। বাংলার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে তোলার স্বার্থে। বাংলার তরুণ তরুণীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে।

বাংলায় বিনিয়োগ টানতে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে মুম্বাইয়ে শিল্পপতিদের সাথে। রাজ্যে পাঁচটি বড় শিল্পাঞ্চল তৈরি ও ১১৮ বছরের পুরোনো কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভুল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

শিল্পের বিকাশের জন্য সরকার শহর অঞ্চলের জমি সংক্রান্ত পুরোনো আইন (আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট) বাতিলের পথে হাঁটছে। ভুল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক সুরক্ষা এবং নারী নিরাপত্তায় দিনরাত এক করে কাজ করছে বাংলার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ভুল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো বিরোধীরা।

# বারুদের নানুরে ব্যালটের মহাবিপ্লব: এক নতুন ভরসার সূর্যোদয়

খোকন দাস ও পল্লব মন্ডল

**তৃণমূলের একচেটিয়া সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসের কারণে নানুর আসনটি বিজেপি সামান্য ব্যবধানে হাতছাড়া করেছে, কিন্তু বীরভূম তথা সমগ্র রাজ্যে আজ গেরুয়া আবিরের বিজয়োৎসব। একদা অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের তথাকথিত অপরাজেয় গড় বলে পরিচিত বীরভূমের ছয়-ছয়টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে জনতা প্রমাণ করেছে যে, ভয়ের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় না।**

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে গত ৪ মে-র ফলাফল কেবলই একটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন নয়, বরং এক যুগের অবসান এবং এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক মহাজাগরণের সূচনা। এই ভূখণ্ডে দীর্ঘ দেড় দশকের তোষণমূলক স্বৈরাচার এবং অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে, দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ভারতীয় জনতা পার্টির এই ঐতিহাসিক উত্থান বাঙালি মনস্তত্ত্বের এক গভীরতম রূপান্তরকে নির্দেশ করে। এটি কেবল ব্যালট বাক্সের সাধারণ জয় নয়; এ ছিল এক চরম অস্তিত্বের লড়াই, যেখানে অবদমিত ও নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ নিজেদের আত্মপরিচয় ও সুরক্ষার তাগিদে এক স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বিগত সত্তরটি বছর ধরে এই পুণ্যভূমি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রক্ত ও আদর্শে গড়া বাঙালির এই সনাতনী হোমল্যান্ডকে ৩৪ বছরের সিপিএমের নাস্তিকতাবাদী অপশাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের উগ্র তোষণনীতি এক চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সনাতনীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, নিজভূমেই তাঁরা পরবাসী হয়ে পড়েছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনোত্তর সুপরিকল্পিত এবং নৃশংস হিন্দু নিধনের যে নারকীয় কর্মযজ্ঞ রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল, ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালেও বিদায়ী শাসকদল ঠিক একই রকমের ধ্বংসলীলা ও দাঙ্গার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু বাংলার জাগ্রত জনতা এবার আর নিষ্ক্রিয় থাকেনি; তাঁরা এই ভোটকে স্রেফ নির্বাচন হিসেবে নয়, বরং বাংলাকে পাপমুক্ত করার এক পবিত্র 'ধর্মযুদ্ধ' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

**২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী ম্যাজিকের ওপর ভর করে যখন প্রথমবার হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে, তখন থেকেই বিদায়ী শাসকদলের ভয় আরও জাঁকিয়ে বসে। ২০২১ সালের নির্বাচনে নানুরে বিজেপি অভূতপূর্ব লড়াই দিলেও, গণনাকেন্দ্রে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী পেশীশক্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জোরে জয় ছিনিয়ে নেয়।**

এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল কবি চণ্ডীদাসের স্মৃতিধন্য নানুর বিধানসভা। একদা শান্তির নীড় বলে পরিচিত এই নানুরকে বামফ্রন্ট ও পরবর্তীকালে তৃণমূলের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা বছরের পর বছর ধরে বোমা, গুলি, রক্ত আর লাশের উপত্যকায় পরিণত করেছিল। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই সূচপুরে ১১ জন নিরীহ খেতমজুরকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর থেকেই নানুর জুড়ে শুরু হয় এক চরম দখলদারির রাজনীতি। সূচপুর, বাসাপাড়া, পাপুড়ি, খালা, সাওতা, শেরপুর, যজ্ঞনগর— প্রতিটি জনপদকে বারুদের গন্ধে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিচার প্রক্রিয়া ভন্ডুল করতে মামলার মূল সাক্ষী আব্দুল খালেক ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকে খুন করা, প্রাক্তন সিপিআই(এম) বিধায়ক আনন্দগোপাল দাসকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে হত্যা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কর্মী ফুলু শেখের খুন— এই সমস্ত নৃশংসতা নানুরের প্রাত্যহিকী হয়ে উঠেছিল।

২০১১ সালের তথাকথিত পরিবর্তনের পরও নানুরের ভাগ্য বদলায়নি, কেবল শোষকের রং বদলেছিল। লাল দুর্গের জায়গায় চেপে বসেছিল জোড়াফুলের হিংস্র ও চাপা সন্ত্রাস। গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ হরণ করে সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী ম্যাজিকের ওপর ভর করে যখন প্রথমবার হিন্দু সমাজ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে, তখন থেকেই বিদায়ী শাসকদলের ভয় আরও জাঁকিয়ে বসে। ২০২১ সালের নির্বাচনে নানুরে বিজেপি অভূতপূর্ব লড়াই দিলেও, গণনাকেন্দ্রে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী পেশীশক্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জোরে জয় ছিনিয়ে নেয়। এর পরেই শুরু হয় সনাতনীদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা— হাজার হাজার হিন্দু পরিবারকে ভিটেমাটি চ্যুত করা হয়, মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়, এবং গ্রামে ফিরে আসার অপরাধে তৃণমূলের পার্টি অফিসে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। এত অত্যাচার, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নানুরের বীর জনতা তাঁদের বাকস্বাধীনতা ও সনাতনী অধিকার পুনরুদ্ধারের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি।

২০২৬-এর এই মহাযুদ্ধে তাঁরা সমস্ত ভয় ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্যালট বক্সে নিজেদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। যদিও তৃণমূলের একচেটিয়া সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসের কারণে নানুর আসনটি বিজেপি সামান্য ব্যবধানে হাতছাড়া করেছে, কিন্তু বীরভূম তথা সমগ্র রাজ্যে আজ গেরুয়া আবিরের বিজয়োৎসব। একদা অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের তথাকথিত অপরাজেয় গড় বলে পরিচিত বীরভূমের ছয়-ছয়টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে জনতা প্রমাণ করেছে যে, ভয়ের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় না।

আজ নানুরের আকাশে-বাতাসে মুক্তির আনন্দ। কিন্তু এই গণরায়কে কালিমালিপ্ত করতে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে অনুব্রত ও কাজল গোষ্ঠী এক নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। নিজেদের গায়ে গেরুয়া আবির মেখে, বিজেপির নাম ভাঙিয়ে তারা দুপুরের পর থেকে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যাতে নানুরের বুকে পুনরায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা যায়। কিন্তু বীরভূম তথা বাংলার জাগ্রত সমাজ আজ এই চক্রান্ত ধরে ফেলেছে। উদাহরণ হল নানুরের বিজেপি নেতৃত্ব; যারা ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ব্যার্থ করে দিয়েছেন সকল প্রকার চক্রান্তকে, আটকে দিয়েছেন ছদ্ম-বিজেপি এই সকল সন্ত্রাসীদের। গ্রামের পর গ্রাম ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে স্পষ্ট করেছেন বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থান; দলীয় সন্ত্রাস ও প্রতি-সন্ত্রাস নয়, বরং ভয়হীন সমাজের সূর্যোদয় হোক হিন্দু গৈরিক ভরসার আলোচ্ছটায়। নানুরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমরা নিজেরাও গেছি বার বার, বিধানসভার ফলাফল আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার পরও। আসলে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের থেকেও, সঙ্ঘ আমাদের বরাবর শিখিয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তনই হল প্রকৃত উন্নয়ন। আমরা নানুরে বিধায়কের গদির রাজনীতিতে জয় লাভ করিনি, কিন্তু ভোট-পরবর্তি হিংসার যে ছবি গত পাঁচ দশক ধরে নানুর দেখেছে, তার অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। আটকে দিয়েছি ষড়যন্ত্রকারীদের; দলীয় মুখোশের রাজনীতি করতে দিইনি দলবদলু সমাজবিরোধীদের; আর সবথেকে বড় কথা, হিন্দুদের সাথে সাথে ভরসা যুগিয়েছি সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষদের, যারা আমাদের ভোটার নন, তবুও মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর হিন্দু শাসনের সাধারন প্রজা। তৃনমূলী অত্যাচারের বিরুদ্ধের গণবিস্ফোরনে অনেক দূর্নীতিগ্রস্থ নেতা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে যথা শীঘ্র সম্ভব শান্তি ফিরে আসে ও যাবতীয় দূর্নীতির বিচার হয় আইনি পথে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন— বিজেপি ভয়ের বা দখলদারির রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। এই ঐতিহাসিক মহাবর্তনের মূল লক্ষ্যই হলো— 'ভয় আউট, ভরসা ইন'। আজ বাংলার মাটি থেকে অপশক্তির বিনাশ ঘটেছে এবং সনাতনী বাঙালি তাঁর হৃত গৌরব ও আত্মপরিচয় ফিরে পেয়ে এক নতুন ভোরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। ভবিষ্যতেও মনে রাখতে হবে, এই লড়াই হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রক্ষার লড়াই; শুধু দলীয় জয়-পরাজয়ের সীমিত অঙ্কে নয়, ভাবতে হবে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। সেদিক থেকে নানুরের বিধানসভায় 'জয়ী' তৃনমূলের 'ভয়' সরিয়ে, বিজেপির 'ভরসা'-ই বিজয়ী হয়েছে।

**২০২৬-এর এই মহাযুদ্ধে তাঁরা সমস্ত ভয় ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্যালট বক্সে নিজেদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। যদিও তৃণমূলের একচেটিয়া সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসের কারণে নানুর আসনটি বিজেপি সামান্য ব্যবধানে হাতছাড়া করেছে, কিন্তু বীরভূম তথা সমগ্র রাজ্যে আজ গেরুয়া আবিরের বিজয়োৎসব। একদা অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের তথাকথিত অপরাজেয় গড় বলে পরিচিত বীরভূমের ছয়-ছয়টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে জনতা প্রমাণ করেছে যে, ভয়ের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় না।**

# ছবিতে খবর

*নিউ টাউন ইকো পার্কে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তির ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।*

*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।*

*কলকাতা মহাজাতি সদনে জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, সংগঠন সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।*

*রাজ্য বিজেপি টিচার্স সেলের শিক্ষক সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, সংগঠন সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয় সহ রাজ্য বিজেপির বিশিষ্ট নেতৃত্ব এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীগণ।*

*সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে কোর কমিটির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।*

*কলকাতার রবীন্দ্র মঞ্চে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন এবং তৎকালীন সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ।*

*পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের মধ্যমগ্রাম আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।*

*কলকাতা উত্তর শহরতলী সাংগঠনিক জেলায় বিকশিত ভারত সংকল্প সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।*

# ছবিতে খবর

মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবের জন্মদিনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বগণের শুভেচ্ছা বিনিময়।

হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীনাথ হলে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর ১০৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী রাহুল সিনহা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ (দিলীপ মহারাজ) ও রাজ্য বিজেপির মাননীয় বিধায়ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

হাওড়ার বাগনানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হওয়া একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী স্বর্গীয় শ্রী প্রশান্ত দে-র বাসভবনে আয়োজিত স্মরণসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী শশী অগ্নিহোত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

*তারাতলার দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী শ্রীমতি অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়া এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুমনা সরকার মহাশয়া।*

*পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের ঐতিহাসিক দিনে 'বাজেট পুস্তিকা' প্রকাশ করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয়।*

*বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপনে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়ের শ্রদ্ধা নিবেদন।*

*রাজ্য বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।*

*একই ফ্রেমে তিন শিক্ষা মন্ত্রী- ডঃ সুকান্ত মজুমদার, শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী দীপক বর্মন।*

# ছবিতে খবর

লালগড়ের পবিত্র মাটিতে প্রেরণা পুরুষ সিধু কানহুর প্রতি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ-এর শ্রদ্ধাঞ্জলী।

বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে হুল দিবস উদযাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

জেলায় জেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

তপন বিধানসভা কেন্দ্রের রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত ঐতিহাসিক হুল দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সল্টলেক রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে 'জনতার দরবারে' মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

# ছবিতে খবর

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অন্নপূর্ণা যোজনার শুভ সূচনা উপলক্ষে অভিনন্দন মিছিল।

ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অন্নপূর্ণা যোজনার শুভ সূচনা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য ধন্যবাদ মিছিল।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুর ও রাঢ়বঙ্গ বিভাগের বিধায়কদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পর্যবেক্ষক ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব।

অন্নপূর্ণা যোজনার শুভ সূচনা উপলক্ষে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অভিনন্দন মিছিল।

কোচবিহার সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অন্নপূর্ণা যোজনার শুভ সূচনা উপলক্ষে অভিনন্দন মিছিল।

# জরুরি অবস্থা ও ভারতীয় জনসংঘ

## রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা থেকে জাতীয় বিকল্প শক্তি

দেবজিৎ দত্ত

**'আমি সবসময়ই বিশ্বাস করতাম যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্রের প্রতি কোনো আস্থা ছিল না, স্বভাবগত ও আদর্শগত দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন একনায়কতান্ত্রিক শাসক। দুঃখজনকভাবে, আমার সেই বিশ্বাসই সত্য প্রমাণিত হয়েছে'**

*- জয়প্রকাশ নারায়ণ, কারাগার ডায়েরি, ২২ জুলাই ১৯৭৫।*

ভারতের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে, যা শুধু একটি সময়কালকে নয়, রাষ্ট্রের চরিত্র এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ঘোষিত জরুরি অবস্থা নিঃসন্দেহে সেই ধরনের একটি ঘটনা। প্রায় একুশ মাসব্যাপী এই সময়ে ভারতের সংবিধান কার্যকর থাকলেও মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার উপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটিই একমাত্র সময়, যখন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পরিসর এতটা সংকুচিত হয়েছিল।

**জরুরি অবস্থার পটভূমি:**

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের বিজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছায়। তাঁকে 'দুর্গা' বলে অভিহিত করা হয় এবং কংগ্রেসের ভিতরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রায় প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। কিন্তু যুদ্ধজয়ের রাজনৈতিক সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক তেল সংকট ভারতের অর্থনীতিকে প্রবলভাবে আঘাত করে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দ্রব্যমূল্য, বেকারত্ব ও শিল্পক্ষেত্রে মন্দা। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অসন্তোষ দ্রুত রাজনৈতিক অসন্তোষে রূপ নিতে শুরু করে। এদিকে গুজরাটে 'নব নির্মাণ আন্দোলন' এবং বিহারে ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি কেবল সরকার পরিবর্তনের নয়, 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' (total revolution) এর ডাক দেন।

জরুরি অবস্থার তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কারণ ছিল ১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা তাঁর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য বলে রায় দেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ অশান্তির ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

**জরুরি অবস্থা ও জনসংঘ:**

এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনসংঘের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জরুরি অবস্থার পূর্বে জনসংঘ একটি উল্লেখযোগ্য কিন্তু সীমিত প্রভাবসম্পন্ন বিরোধী দল হলেও, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলটি জাতীয় রাজনীতিতে নতুন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানের পেছনেও এই সময়কার অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক ভাবে জয়প্রকাশের আন্দোলনের সাথে জনসংঘের একীভূত হওয়াকে অনেকেই ভাল চোখে নেন নি। কারন জনসংঘ তাদের মতে ছিল একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল যার সাথে জয়প্রকাশের রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তা মেলে না।

কিন্তু সেইসব আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে জয়প্রকাশ নারায়ণ স্পষ্টভাবে বলেন যে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে মতাদর্শগত বিভেদ গৌণ। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু হয়। জনসংঘ ছিল সরকারের প্রধান লক্ষ্যগুলির অন্যতম। দলের সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে গ্রেফতার করা হয়। লালকৃষ্ণ আদবানি, নানাজি দেশমুখ, বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, সুন্দর সিং ভান্ডারী, ভাই মহাবীর, জগন্নাথরাও যোশীসহ বহু শীর্ষ নেতা বন্দি হন। হাজার হাজার কর্মীকে M I S A (Maintenance of Internal Security Act) এর আওতায় বিচার ছাড়াই কারাগারে পাঠানো হয়।

**জনসংঘের প্রতিরোধ:**

জরুরি অবস্থার সময় সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া সংবাদ প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বহু সংবাদপত্রের

বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, সম্পাদকদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয় এবং সরকারের সমালোচনামূলক

প্রতিবেদন প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনসংঘ গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপের ফলে জনসংঘ বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। গোপনে ছাপানো লিফলেট, পুস্তিকা, সংবাদ-বুলেটিন এবং হাতে লেখা প্রচারপত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি এই প্রচারপত্র পৌঁছে দেওয়া হতো। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

আরএসএসের বিস্তৃত সাংগঠনিক নেটওয়ার্কও এই সময়ে বহু কর্মীকে নিরাপদ আশ্রয়, যোগাযোগ ও প্রচার ব্যবস্থার সহায়তা প্রদান করে। কারাগারের মধ্যেও জনসংঘের নেতারা প্রতিরোধের মনোভাব বজায় রাখেন। লালকৃষ্ণ আদবানি তাঁর কারাবাসের অভিজ্ঞতায় লিখেছেন যে বন্দী নেতাদের কাছে এই সংগ্রাম ছিল ভারতের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। বন্দী শিবিরগুলিতে বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলে।

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সমাজবাদী গোষ্ঠী এবং কংগ্রেস (ও) সহ বিভিন্ন দল জয়প্রকাশ নারায়ণের নৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির জন্ম হয় এবং জনসংঘ তার অন্যতম প্রধান সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে জনগণ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্ট রায় দেয়। নতুন সরকারে জনসংঘ থেকে উঠে আসা অটল বিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লালকৃষ্ণ আদবানি তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হন। এটি ছিল জনসংঘের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রথমবারের মতো জনসংঘের নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পান এবং জাতীয় রাজনীতির মূল ধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে তার নেতৃত্বের বড় অংশই জনসংঘের রাজনৈতিক ঐতিহ্য বহন করে।

**জরুরি অবস্থা এক ঝাক নতুন নেতার উঠে আসা:**

জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনৈতিক কৌশল ও নীতির ফলে ভারতীয় জনসংঘের

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের আগে জনসংঘকে মূলত একটি সীমিত প্রভাবসম্পন্ন, উত্তর ভারতকেন্দ্রিক দল হিসেবেই দেখা হতো। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন দুর্নীতি, স্বৈরতন্ত্র ও প্রশাসনিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় গণআন্দোলনের ডাক দেন, তখন তিনি জনসংঘ ও আরএসএসকে সেই আন্দোলনের অংশ হওয়ার সুযোগ দেন। এর ফলে জনসংঘ প্রথমবারের মতো নিজেকে কেবল একটি হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে নয়, বরং গণতন্ত্র রক্ষার বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের ব্যক্তিগত সততা, নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা জনসংঘের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বহু মানুষ, যারা আগে জনসংঘ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, তারা জেপির নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে শুরু করেন।

জরুরি অবস্থার সময় কারাবন্দি হওয়া বহু নেতা পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি জরুরি অবস্থার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। কারাবাস ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম তাঁদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় এবং পরবর্তীকালে বিজেপির উত্থানের ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করে। বাজপেয়ী জনসংঘ ও পরে বিজেপিকে একটি গ্রহণযোগ্য সংসদীয় রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, আর আদবানি সংগঠনকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই অর্থে জরুরি অবস্থা শুধু গণতন্ত্রের সংকট নয়, বিজেপির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু ছিল।

## জরুরি অবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তার প্রভাব:

১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার আগে থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, নকশাল আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় দমননীতি এবং কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান ছিল। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে বিরোধীরা ব্যাপক কারচুপিপূর্ণ বলে আখ্যা দেয়, যার ফলে কংগ্রেস সরকারের গণতান্ত্রিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। বহু রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা গ্রেফতার হন, সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করা হয় এবং প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি পায়। তবে উত্তর ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল, কারণ রাজ্যের রাজনৈতিক সমাজ ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত ও দমননীতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।

তবে জরুরি অবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময়ে। জরুরি অবস্থার কারণে কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিরোধী রাজনীতির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। জরুরি অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরকে সুসংঘটিত করে, ফলে ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে এবং পরবর্তী তিন দশকেরও বেশি সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস। এটি শুধু কংগ্রেসের দুর্বলতাকে প্রকাশ করেনি, বরং বামপন্থী রাজনীতিকে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার সুযোগও তৈরি করেছিল।

তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই সময়ে দলটি দমন-পীড়নের শিকার হলেও রাজনৈতিকভাবে আরও পরিণত এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কারাবাস, সাংগঠনিক সংগ্রাম, বিরোধী ঐক্যের অভিজ্ঞতা জনসংঘকে জাতীয় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে। অতএব, জরুরি অবস্থার ইতিহাস শুধু ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপের ইতিহাস নয় এটি জনসংঘের রাজনৈতিক রূপান্তর, বিরোধী ঐক্যের বিকাশ এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতার ইতিহাসও বটে। জনসংঘ থেকে বিজেপির উত্থানকে বুঝতে গেলে জরুরি অবস্থার এই অধ্যায়কে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েই মূল্যায়ন করতে হবে।

LARSEN & TOUBRO
লার্সন এণ্ড টুব্রো
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে
ফিরছে নতুন গতি
L&T-এর ২,৫০০ কোটি টাকার ডেটা সেন্টার
গড়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি বার্জার পেইন্টসও
বিনিয়োগ বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
বিজেপি শাসিত পশ্চিমবঙ্গ
আবারও শিল্প, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানের
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে
/BJP4Bengal bjpbengal.org

# বাঙালির ইতিহাস বিস্মৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্র

কৌশিক কর্মকার

**'...আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক, ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।' ঋষি বঙ্কিম উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন 'বাঙ্গালী'র প্রতি; এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমের এই আবেদনের গুরুত্ব আজও কি আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি? আজও কি বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়েছে?**

১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'; প্রবন্ধের সূচনা অংশটি এরূপ: 'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।' এই বক্তব্যে লেখকের আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। এই বক্তব্যের বছর ছ'য়েক পরে বঙ্গদর্শনের ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম আবারও জানাচ্ছেন: 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধও হয় না।'

লক্ষণীয়, লেখকের বক্তব্যের সুরটি কমবেশি একইরকম। অর্থাৎ আলোচ্য সময়কালের মধ্যে লেখকের চোখে এজাতীয় কোন উদ্যোগ নজরে পড়েনি। ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বঙ্কিম যেমন পুনরাবৃত্তভাবে সোচ্চারে উচ্চারণ করেছেন, তেমনই তিনি কোন্ইতিহাস লেখা হবে ও কে সেই ইতিহাস লিখবে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে বলছেন: 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি

লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মারা যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক, ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।' ঋষি বঙ্কিম উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন 'বাঙ্গালী'র প্রতি; এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমের এই আবেদনের গুরুত্ব আজও কি আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি? দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জানাতে হয়, উক্ত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু নেতিবাচক। আজও বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয়নি। তার ফলাফল আজ লক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র; ইতিহাসবিস্মৃত, আত্মবিস্মৃত এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমের অভাবনীয় দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিম সমকালীন সময়ে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন ইউরোপীয় সাহেবরা। তাঁদের সেই ইতিহাস রচনার উৎস কোথায় ছিল? কোথা থেকে তাঁরা ইতিহাসের উপাদান, তথ্যসূত্র গ্রহণ করেছেন? মধ্যযুগের সেই 'আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের' কাছ থেকে। এই ইতিহাস যে কতখানি অসত্য, রাজনৈতিক মতাদর্শপুষ্ট, 'স্বকপোলকল্পনার' উপর নির্মিত, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিম প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর মাধ্যমে বখিতয়ার খিলজির বাংলা জয়; যা কিনা মিনহাজউদ্দিনের বানানো গল্পের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; কিন্তু আজও এই 'ইতিহাসের' প্রবহমানতা অব্যাহত আছে। বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই 'ইতিহাস' জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন: 'এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই। কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিনহাজ্ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?' অর্থাৎ কারণটি হল 'চাকরী'! কারণটি আদ্যন্ত অর্থনৈতিক। এভাবেই বানানো গল্প, ইতিহাস হয়ে যায় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে। প্রকৃত ইতিহাস চাপা পড়ে যায় এহেন বিশাল প্রচারযন্ত্রের নীচে; সেই প্রচারযন্ত্রের দাঁত-নখ অগ্রাহ্য করে তা প্রায় কখনোই বেরিয়ে আসতে পারে না। আজকের বিদ্যায়তনিক জগতেও এরকম দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই।

ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশভাগ। কেবল এই একটি ঘটনা অসংখ্য মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে, অসংখ্য মানুষকে নিহত করেছে, অসংখ্য নারীকে ধর্ষিতা করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের হিন্দু জনগণ। তাঁদের দুর্গতির কোন সীমা পরিসীমা নেই। এই অজস্র হতভাগ্য জনতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা লেখকবর্গও রয়েছেন। তাঁরা, তাঁদের পরিবার এই দুর্গতির প্রত্যক্ষ শিকার। তবু তাঁরা এই বিষয়ে বোবা হয়ে রইলেন, সত্যের প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যে পরিস্ফুট হল না। বাংলা সাহিত্যের এহেন নীরবতার কারণ বুঝতে গেলে অখণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা জানা দরকার। বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা এসময়ে প্রায় সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত। পার্টির নির্দেশের কারণে বা পার্টির লাইন মেনে চলতে গিয়েই তাঁরা এই বিষয়ে মৌন থেকেছেন। সাহিত্যিকেরা 'প্রগতি লেখক সংঘ' বা পরবর্তীকালে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে'র সদস্য ছিলেন; যে সংঘ পরিচালিত হত কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে।

পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘুর ব্যাপক উদ্বাসনের এই ঘটনাকে কমিউনিস্টরা কখনো অর্থনীতির নিক্তিতে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কখনো বা এর পিছনে ভূমি সংস্কারের মত কারণ খুঁজে পেয়েছেন। এখনও তারা সভা-সমিতিতে সোচ্চারে ঘোষণা করে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের আত্মবিকাশের পরিসর তৈরির জন্য দেশভাগ প্রয়োজন ছিল। তারা এইরূপ ব্যাখ্যা দেবেই কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে মুসলিম লীগের চেয়েও কিছু অংশে বেশি আগ্রহী ছিল এই কমিউনিস্টগণ। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্টরা প্রকাশ করে কুখ্যাত অধিকারী থিসিস যেখানে জাতি হিসেবে ভারতীয়ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় এবং সেইসঙ্গে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকার করা হয় যা ছিল কার্যত ১৯৪০ সালের মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের একটি সমর্থক প্রস্তাব মাত্র। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগ ১৯৪৫ সালের ২৪ মার্চ একটি খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে যার মূল বক্তব্য ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের আধারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সেই ইস্তেহার লিখে দেন কমিউনিস্ট নেতা নিখিল চক্রবর্তী। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল সেই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়ে। কমিউনিস্টদের ট্রাম শ্রমিকদের সংগঠন ছাড়াও হাওড়ার বেশকিছু শ্রমিক সংগঠন লিগের হয়ে প্রচার শুরু করে। সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র প্রকাশ সেই দিন বন্ধ রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র মুসলিম লিগের প্রতি কমিউনিস্টদের সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশের জন্য। ময়দানে লিগের আয়োজিত সভাতেও যোগ দিয়েছিল তারা। যেভাবে লিগের এই কর্মসূচিতে কমিউনিস্টরা সর্বাত্মকভাবে অংশ নিয়েছিল, সেই হিসেবে ধরে নেওয়া যায় লিগের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়েও তাদের কাছে যথেষ্ট খবর ছিল। আর লিগ নেতৃত্ব যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ডিরেক্ট একশন ডে'কে

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে'তে পর্যবসিত করেছিল তা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় তাদের পূর্ব-প্রস্তুতি থেকে। কলকাতা শহরের চব্বিশটি থানার মধ্যে বাইশটি থানার দায়িত্ব মুসলমান পুলিস আধিকারিকের হাতে অর্পিত হয়েছিল, বাকি দুটি থানার দায়িত্বে ছিলেন দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। পেট্রল নেওয়ার জন্য প্রচুর কুপন দেওয়া হয়েছিল মুসলিম সংগঠনগুলিকে। আগাম একমাসের রেশন জোগাড় করে দেওয়া হয় লিগের নেতাকর্মীদের। সর্বোপরি উক্ত দিনে লিগের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী তার সকল সহকারীদের নিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থেকে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং এই কর্মসূচির একমাত্র লক্ষ্য ছিল হিন্দু নিধন, হিন্দু সম্পত্তির ধ্বংসসাধন ও হিন্দুদের ভয় প্রদর্শন। লিগ নেতাদের এই পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ সার্থক করে তুলতে রীতিমতো সক্রিয় প্রচারপর্ব চালিয়েছিলেন বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ।

সাতচল্লিশে দেশভাগ হয়েছে; মুসলিম লিগ তার অংশ বুঝে নিয়েছে; পূর্ববঙ্গ কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে; তবে তার মৌলবাদী চরিত্রের কোন বদল ঘটেনি। ব্রিগেডের সভা থেকে আজ শোনা যাচ্ছে দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা। বস্তুত দলিত-মুসলিম ঐক্য বিষয়টিকে শতাব্দীর সেরা প্রতারণা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। যে প্রতারণার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের করুণ পরিণতি। যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজের অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন; নিম্নবর্গের দলিতসমাজ যার কথায় লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবও সমর্থন করেছিল; দেশভাগের পরবর্তীকালেও তারা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিল যার ভরসায় সেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে তার পদত্যাগপত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হতভাগ্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভবিতব্য তাঁর পদত্যাগপত্রে উল্লিখিত হয়েছে

I have come to the conclusion that Pakistan is no place for Hindus to live in and that their future is darkened by the ominous shadow of conversion or liquidation. The bulk of the upperclass Hindus and politically conscious scheduled castes have left East Bengal. Those Hindus who will continue to stay accursed in Pakistan will, I am afraid, by gradual stages and in a planned manner be either converted to Islam or completely exterminated.

প্রাজ্ঞ যোগেনবাবুর বহু অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি: পাকিস্তানে হিন্দুদের কোন জায়গা নেই। যারা এখনও রয়ে গেছেন

তাদের ধীরে ধীরে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে হয় নিকেশ করা হবে, নয় ধর্মান্তরিত করা হবে।

যোগেনবাবুর কথাকে সত্যি প্রমাণ করে এরপর থেকেই পাকিস্তানে থেকে যাওয়া নিম্নবর্গীয় হিন্দু জনসমাজ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পশ্চিম পানে পাড়ি জমাতে থাকে। বনগাঁ, শিয়ালদা স্টেশন, বহু ট্রানসিট ক্যাম্প, পি এল ক্যাম্প, সেটলার্স ভিলেজ ঘুরে মূলত ১৯৬৫-৭০ কালপর্বে আগত এসকল উদ্বাস্তুদের স্থান হয়েছিল ঊষর দণ্ডকারণ্যে। এরা প্রায় সকলেই ছিল নিম্নবর্গীয়, মূলত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা বাঁচার আশায় বৃষ্টিশূন্য দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত জনহীন দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে। কমিউনিস্ট রাজ্য সরকার এই নিঃস্ব, দীর্ণ, পুনরাবৃত্তভাবে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর উপর প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালানো, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশের মত কিছু হাস্যকর দোষারোপ করে ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে মরিচঝাঁপি দ্বীপে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করে। উদ্দেশ্য তাদের সমূলে উচ্ছেদ করা। ওই বছরেরই ১৪ থেকে ১৬ মে পুলিশের সঙ্গে মুখে কাপড় বাঁধা ক্যাডার বাহিনী দিয়ে তাদের বাড়ি ঘর, স্কুল, দোকান সব ধ্বংস করে সরকার তাদের পুনরায় উদ্বাস্তু করে ছাড়ে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুসলিম ক্যাডারবাহিনী দিয়ে উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনরায় উদ্বাসিত করা হয় কারণ মুসলিম ক্যাডারবাহিনী বিধর্মী উদ্বাস্তু উচ্ছেদে অধিক দয়ামায়াহীন হতে পারবে। মধ্যপ্রদেশের মানা ক্যাম্পে যখন এই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর উপর গুলি চলেছিল তখন তারা গড়ে তুলেছিল উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি। এই সমিতির প্রচার সচিব রাধিকা রঞ্জন বিশ্বাস সব-হারানো এই উদ্বাস্তু জনগণকে আবার উদ্বাস্তু করার পিছনের রাজনৈতিক কারণ স্পষ্ট করেছেন। তিনি জানিয়েছেন সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল কলিমুদ্দিন শামসের নেতৃত্বে মুসলিম জনমতের চাপে। নিজের জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়া যে কোন মানুষের কাছে মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও বেদনাবহ। দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গের আপামর হিন্দু জনগোষ্ঠীকে এক কাপড়ে তাদের সাত পুরুষের ভিটে ছাড়তে হয়েছিল। বলা বাহুল্য পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা কর্মসংস্থানের তাগিদে তারা দেশ ছাড়েনি, দেশ তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে।

জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনার দায়িত্ব সর্বতোভাবে সেই জাতির; নতুবা সেই ইতিহাস বিকৃতভাবে, অসত্যের আবরণে প্রকাশিত হবে অথবা জনমানস থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে। যার অনিবার্য পরিণতি আজ লক্ষ করা যাচ্ছে; যার ফলে তৈরি হয়েছে এক ইতিহাসবিস্মৃত, আত্মবিস্মৃত প্রজন্ম; যার বেড়ে ওঠা হয়তো কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে, কিন্তু দেশভাগের ইতিহাস বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এই ইতিহাস বিস্মৃত জাতিকে ইতিহাস শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার দায়িত্ব সর্বতোভাবে সকলের, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।

# ঐতিহ্যের মর্যাদায়, মুকুটমণিপুরে হুল বিদ্রোহের বীরদের সম্মান

এতদিন যে স্থানে বিশ্ব বাংলা গ্লোব ও হরিণের ভাস্কর্য ছিল, সেই জায়গাতেই এবার স্থাপন করা হলো সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহান নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী **সিধু ও কানুর মূর্তি**

# অবহেলিত ইতিহাসকে মর্যাদা দেওয়াই বিজেপির অঙ্গীকার

/BJP4Bengal bjpbengal.org

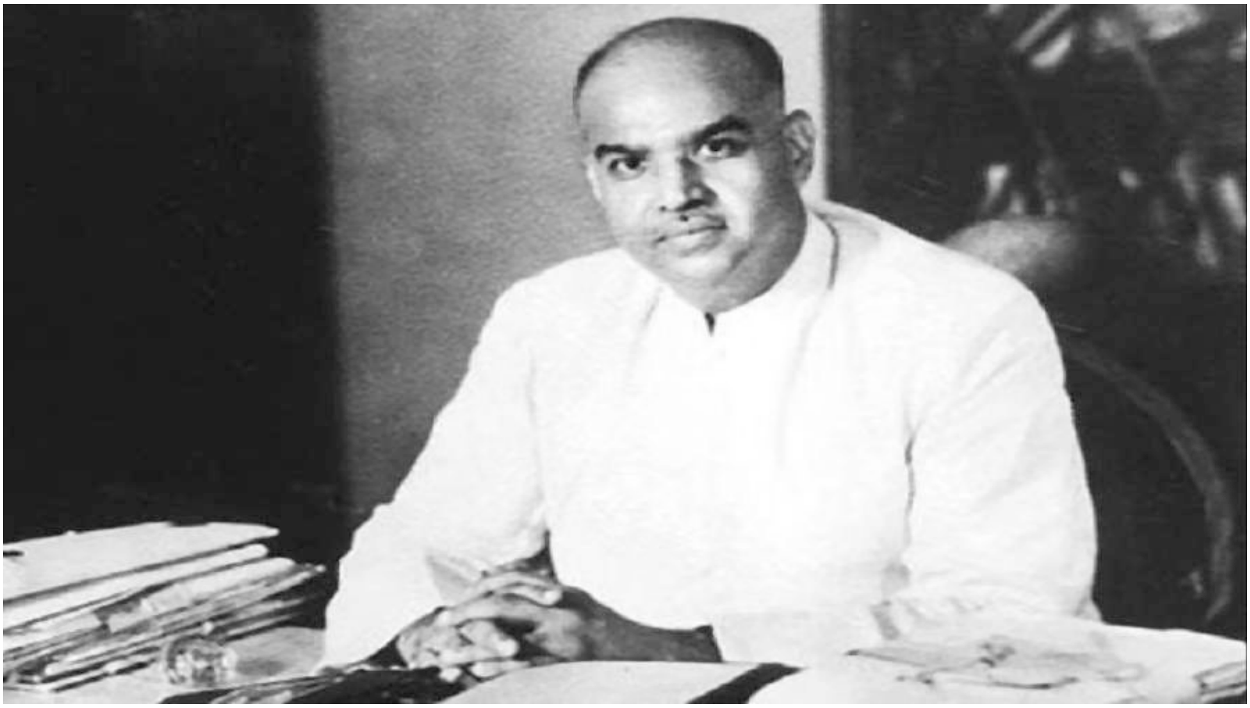

# অনন্য ব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

**দিব্যেন্দু দালাল**

**স্বাধীনতার পর এই প্রথম। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রথম। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি সম্মান জানিয়ে মহাসমারোহে সরকারি ভাবে পালিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এতগুলো দিন ধরে এত এত নেতা, এত এত রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে দেয়নি। কিন্তু যার ভাবনা নিয়ে এত আপত্তি তাঁর ভাবনাই অবশেষে গেরুয়া করে দিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। ৬ জুলাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস। তাঁর স্মরণে তাঁর অসামান্য জীবনের গল্প। এই সংখ্যায় শেষ কিস্তি।**

*(প্রথম কিস্তির পর)*

২২ জুন গুরু দত্ত বৈদকে জানানো হয় যে ড. মুখার্জি তাঁকে অবিলম্বে দেখতে চান। বৈদ দ্রুত তাঁর কক্ষে পৌঁছে দেখেন যে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা ৯৭° ফারেনহাইটে নেমে এসেছে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে ড. মুখার্জির সহযোগীরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা জেল সুপারিন্টেনডেন্টকে জানান। কিছুক্ষণ পর সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ড. আলি মোহাম্মদ জেলে পৌঁছান এবং সুপারিন্টেনডেন্টকে পরামর্শ দেন যে ড. মুখার্জিকে অবিলম্বে একটি নার্সিং হোমে স্থানান্তর করা উচিত। কিন্তু বিস্ময়করভাবে জেল সুপারিন্টেনডেন্ট তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি এনে দিতে বলেন।

ড. মুখার্জির সহযোগী গুরু দত্ত ও টেক চাঁদ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু ড. মোহাম্মদ তা করতে অস্বীকার করেন এবং বলা হয় যে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমি আপনাদের উদ্বেগ বুঝতে পারছি, কিন্তু চিন্তা করবেন না। সেখানে তিনি আরও ভালো চিকিৎসার হাতে থাকবেন।"

প্রায় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে জেল সুপারিন্টেনডেন্ট একটি ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এরপর ড. মুখার্জিকে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত রাজ্য হাসপাতালের স্ত্রীরোগ (গাইনোকোলজিক্যাল) বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়; কোনো নার্সিং হোমে নয়।

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন পুলিশ সুপার গুরু দত্ত ও টেক চাঁদকে জানান যে ড. মুখার্জির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তাঁরা দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যান এবং ভোর ৪টায় সেখানে পৌঁছালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানান যে ড. মুখার্জি ভোর ৩টা ৪০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই সন্দেহজনক মৃত্যুর পরও সরকার নিয়ম উপেক্ষা করে কোনো পোস্টমর্টেম করায়নি।

পরিবর্তে মরদেহ সরাসরি কলকাতায় বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ হেফাজতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আকস্মিক ও চমকপ্রদ মৃত্যু সারা দেশে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। ড. মুখার্জির মা, যোগমায়া দেবী, জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে সমবেদনা বার্তা পাওয়ার পরই তাঁর পুত্রের এই সন্দেহজনক মৃত্যুর বিষয়ে একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু করার অনুরোধ জানান। কিন্তু নেহরু জানান যে ঘটনাটির সঙ্গে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তির মতামতে তিনি সন্তুষ্ট এবং ড. মুখার্জির মৃত্যুর পেছনে কোনো রহস্য রয়েছে—এমন সম্ভাবনাকে তিনি নাকচ করে দেন।

যুগান্তর
JUGANTAR
শ্যামাপ্রসাদ বিয়োগে শোকার্ত কলিকাতা
প্রিয় নেতার শেষ দর্শনের জন্য সারা রাত্রি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোকের অপেক্ষা
শোকস্তম্ভিত কলিকাতাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ঃ সর্বপ্রকার যান চলাচল বন্ধ
বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে জীবনদীপ নির্বাপিত

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী ছিল, তা কেউ জানে না—হয়তো কোনো দিনই জানা যাবে না। তবে আজ বহু ভারতীয়ের মনে এই বিশ্বাস ও সন্তুষ্টি রয়েছে যে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করার লক্ষ্যে ড. মুখার্জির যে আত্মত্যাগ, তা বৃথা যায়নি।

শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদান নেহরু সরকারকে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে 'পারমিট রাজ', 'ওয়াজির-ই-আজম' (প্রধানমন্ত্রী) এবং 'সদর-ই-রিয়াসত' (রাষ্ট্রপ্রধান) পদ বিলোপ করতে বাধ্য করে। তাঁর ত্যাগের ফলেই ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধান, ভারতের সংসদ, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের আওতায় নিয়ে আসে। ১৯৫৩ সালের আগে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সেখানে কোনো কার্যকর ভূমিকা ছিল না।

ড. মুখার্জির আত্মবলিদান কয়েক দশক ধরে মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত রয়েছে এবং আজও তা সমানভাবে স্মরণীয়। কাশ্মীর সম্পর্কে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, অনেকের মতে তা বাস্তবায়িত হয় ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট, যখন নরেন্দ্র মোদীর সরকারের উদ্যোগে ভারতের সংবিধানের বিতর্কিত ধারা ৩৭০ বাতিল করা হয় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করা হয়। এই পদক্ষেপকে ড. মুখার্জির দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন এবং তাঁর স্বপ্নের কাশ্মীর গঠনের পথে এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ছিল।

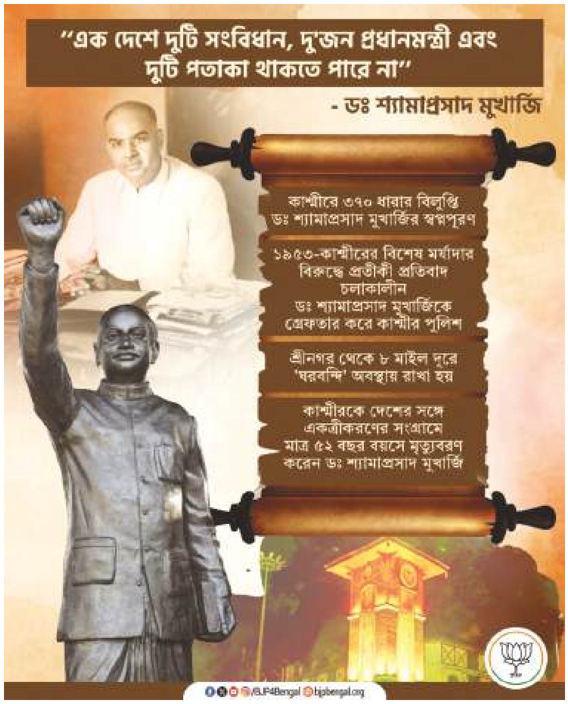


দেশ যখন তাঁর সেবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভব করছিল, তখনই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে হারাতে হয়। তবে তাঁর উত্তরাধিকার জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রচেতনার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাঁর আদর্শ আগামী প্রজন্মের জীবন ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অন্তরে ও আত্মায় একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী। "দেশ সবার আগে" ছিল তাঁর মূলমন্ত্র এবং "বাঁচো এবং বাঁচতে দাও" ছিল তাঁর জীবনের দর্শন। তিনি দেশের স্বার্থে বেঁচেছিলেন এবং দেশের স্বার্থেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে শিক্ষা ও নারীর অধিকার সম্পর্কে তাঁর দূরদর্শী মতামত তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা হিসেবে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল সময়ের অনেক আগেই অগ্রসর। আবার একজন দার্শনিক-রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলারও তাঁর নিজস্ব সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তৃতাগুলোর কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ নিচে তুলে ধরা হলো। বক্তৃতাগুলো বহু পুরোনো হলেও, সেগুলোর বক্তব্য ও বার্তা আজও সমানভাবে প্রাণবন্ত, অনুপ্রেরণাদায়ক এবং প্রাসঙ্গিক।

### শিক্ষা সম্পর্কে

"ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নতুন ভারত গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

নিজেদেরকে দেশের জীবনধারার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একান্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারে না। তাদের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতার শিক্ষা গভীরভাবে সঞ্চার করা, তাদের মনে ঐক্য, শক্তি ও নির্ভীকতার চেতনা জাগিয়ে তোলা, এবং দক্ষতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করা।"

### বৈদেশিক সম্পর্ক সম্পর্কে

"ভারতীয়রা হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিবেশী জাতি ও জনগণের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করেছে। যখন ভারতীয়রা বিদেশে গিয়েছে, তখন তারা সঙ্গে করে অস্ত্র বা গোলাবারুদ নয়, বরং শান্তি ও সদিচ্ছার বার্তা বহন করে নিয়ে গেছে।"

### পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে

"ভারত কেবলমাত্র নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, বিশেষত যখন পারমাণবিক শক্তির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা দেখতে পারি যে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণার ফলাফল মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলছে।"

"পারমাণবিক শক্তি পৃথিবীতে এক স্বর্গসম পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং মানবজাতিকে বহু কষ্টসাধ্য শ্রম থেকে মুক্তি দিতে পারে। এটি এমন এক শক্তির উৎস, যার পরিমাণ প্রায় সীমাহীন, যা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এবং মানবজাতির প্রতিটি প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

### শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আগমন

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সবচেয়ে বড় অবদান হল পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বৃটিশরাজকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সঙ্গেই যুক্ত রাখতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কাছ থেকে তাঁর রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন -

"স্বামীজী মহারাজের(স্বামী প্রণবানন্দজী) সহিত বহুবার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত কয়েকটি জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা। ...আমার মনে হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্বজয় করিতে সমর্থ হইবে। এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ - সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেশকে জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই । ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময় ভারতের দিব্যস্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দ। তাঁর উদ্দেশে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিতেছি।" (উদ্ধৃত অংশটি 'মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী প্রণবানন্দ' - সংকলক স্বামী আত্মানন্দ - থেকে গৃহিত)।

আজ বড় আনন্দের দিন যে এই দুই মহাপুরুষের প্রেরণালব্ধ দল ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে আজ সরকার গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে।

প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেশেলসের জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক ভাষণ।

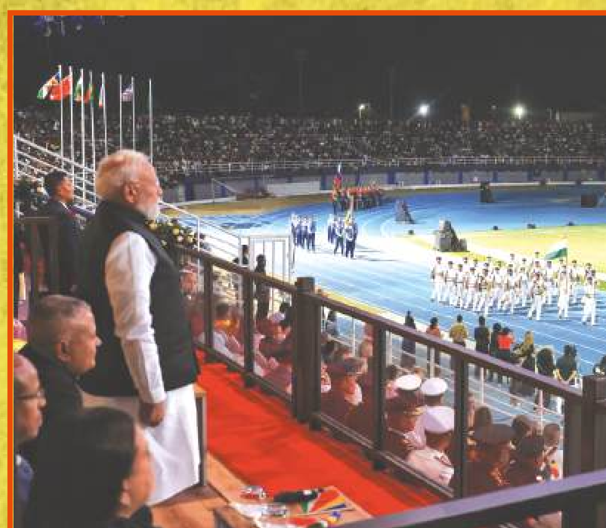

সেশেলস-এর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় দিবসের উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

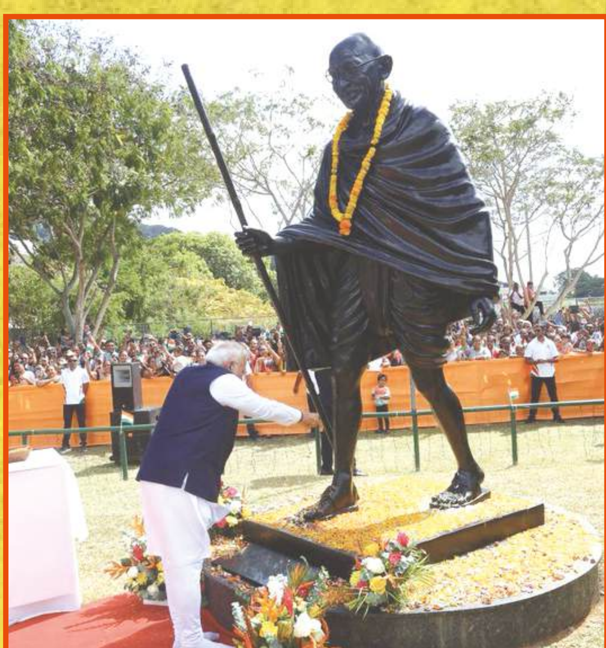

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সেশেলস-এর 'পিস পার্ক'-এ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সেশেলস-এর রাজধানী ভিক্টোরিয়ায় সেদেশের একমাত্র হিন্দু মন্দির 'আরুল মিহু নবশক্তি বিনায়গর' (শ্রী গণেশ)-এ পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

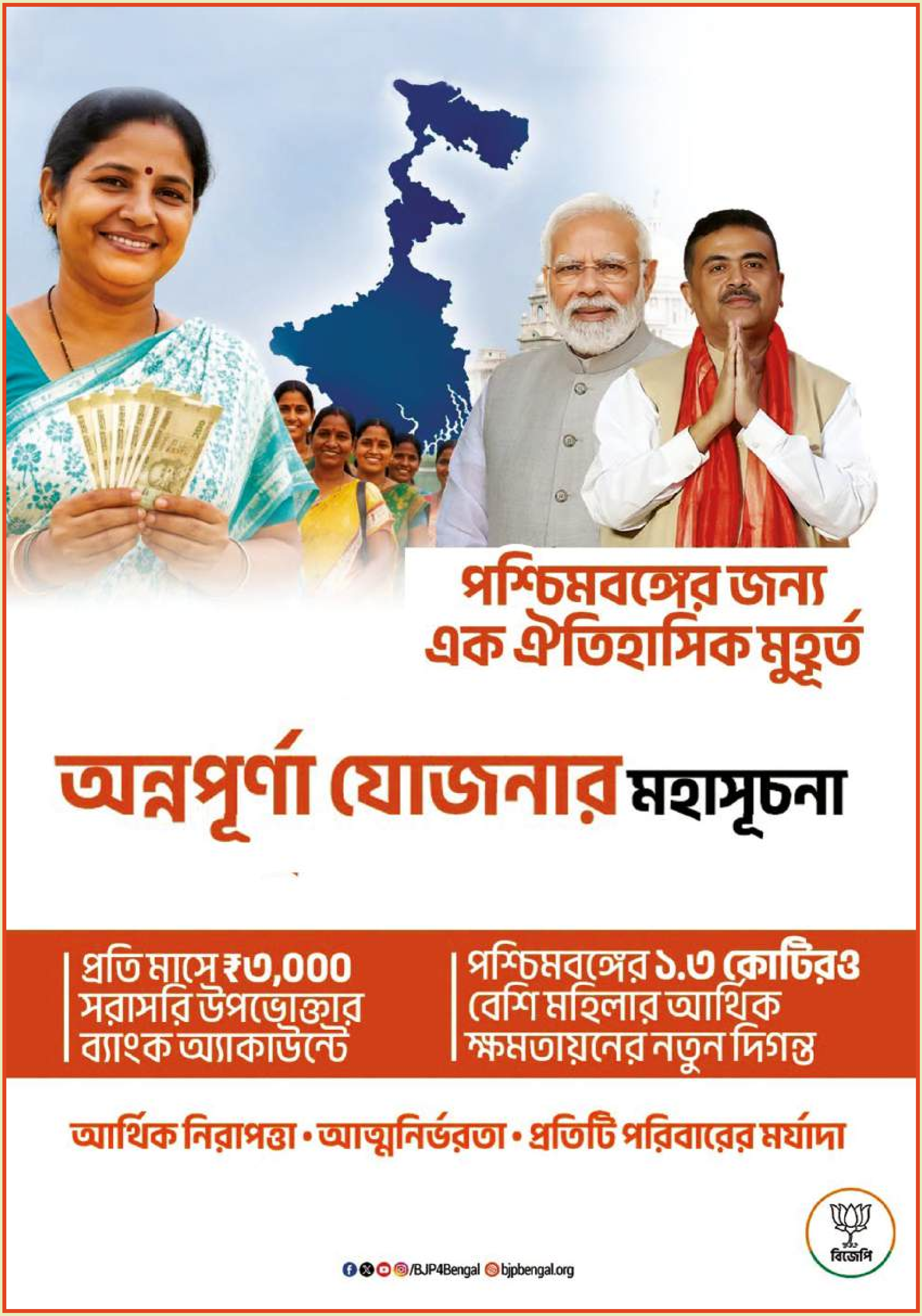


ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।